সের্গেই বারুজদিন

রবি ও শশী

সের্গেই বারুজদিন

অনুবাদ: চৈতী রহমান

রবি ও শশী

MINI PROGRESS & MINI RADUGA

С. БАРУЗДИН

РАВИ И ШАШИ

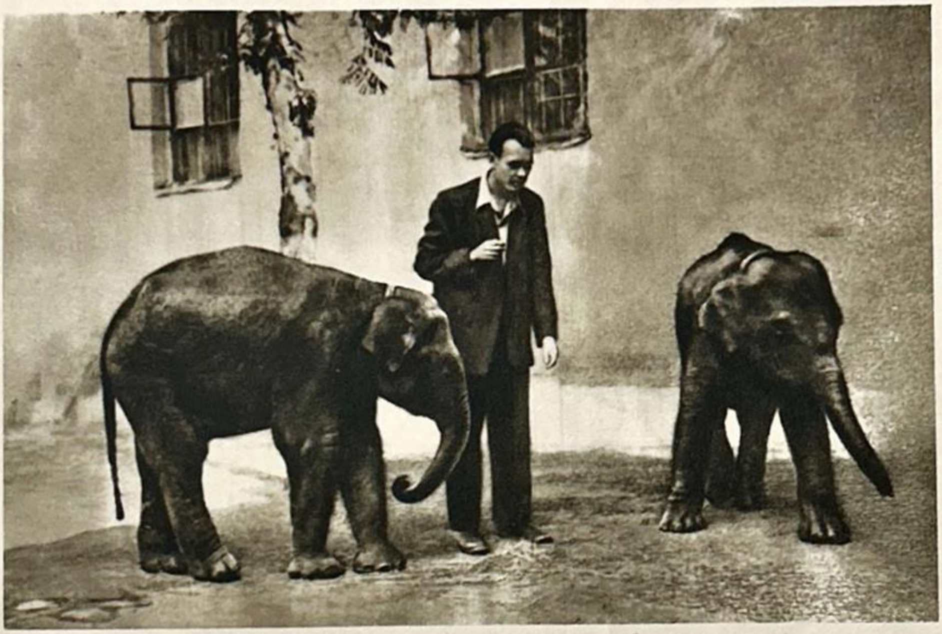

রবি আর শশী এখনও শিশু। সকল শিশুর মতোই ওরা কখনও খেলে, কখনও লাফালাফি করে, আবার কখনও কাঁদতে শুরু করে। আর ওদের খাবারও ছোট বাচ্চাদের মতোই— চাল, চিনি আর দুধ দিয়ে বানানো পায়েস ওদের মুখে পুরে দেওয়া হয়। এটা না করলে ওরা মোটেও কিছু খেতে পারে না।

রবি আর শশী যদি রুশ ভাষা বুঝত, তাহলে ওরা জানতে পারত আমাদের ভাষায় ওদের নামের অর্থ কী: ‘সোলন্তসে’ আর ‘লুনা’— সূর্য আর চাঁদ। মানে রবি আর শশী।

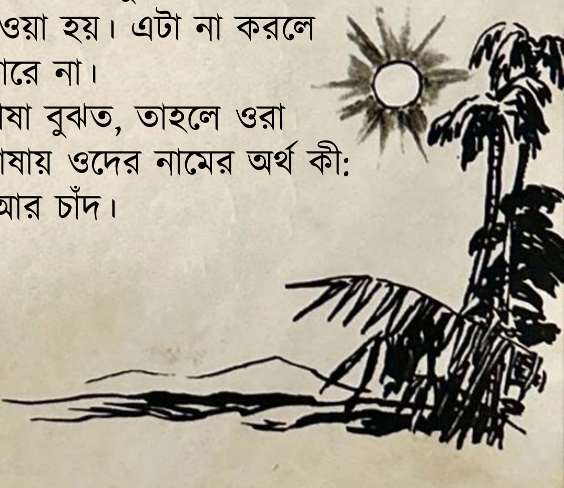

কিন্তু ওরা এখনো ওদের রুশ নামগুলো জানে না।

'সোলন্তসে! সোলন্তসে!' — বাচ্চারা রবিকে ডাকে, কিন্তু সে তার শুঁড়টাও নাড়ায় না। 'লুনা! লুনা!'— বাচ্চারা শশীকে ডাকে, কিন্তু সে ফিরেও তাকায় না। 'ওদের চিনতে নিশ্চয়ই আমাদের কোনও ভুল হচ্ছে,' বাচ্চারা বলে। 'দেখো, ওরা দেখতে একদম একই রকম, আমরা বোধহয় একজনের নাম ধরে আরেকজনকে ডাকছি।'

এটা সত্যি যে রবি আর শশী দেখতে অনেকটা একই রকম ছিল। কিন্তু ওরা ভাইবোন নয়, এমনকি ওরা দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও নয়।

রবি ও শশী ভারতের দুটি হাতিশাবক, এবং তারা মাত্র কিছুদিন হয় আমাদের দেশে এসেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সোভিয়েত শিশুদের জন্য উপহার হিসেবে এদের পাঠিয়েছেন।

নেহরু লিখেছিলেন, "সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকাকালীন আমার বহু সংখ্যক শিশুর সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছিল, এবং সর্বত্র তারা আমাকে ভারতের শিশুদের জন্য শুভেচ্ছাবার্তা উপহার দিত। এখন ভারতের শিশুদের পক্ষ থেকে আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের শিশুদের জন্য দুটি বেশ বড়সড় দেখতে উপহার পাঠাচ্ছি। এই উপহার হল দুটি হাতিশাবক। দেখতে বড় মনে হলেও এরা আসলে এখনও শিশু, মাত্র এক বছর বয়সী। এরা ভারতের শিশুদের দূত হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিশুদের কাছে যাচ্ছে, সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে বন্ধুত্ব ও শুভকামনা...

আশা করি সোভিয়েত ইউনিয়নের শিশুরা এই ভারতের এই দুই ছোট্ট দূতের সাথে বন্ধুত্ব করবে এবং ভারতের সেই শিশুদের কথা মনে রাখবে যাদের প্রতিনিধি এই ছোট্ট হাতিশাবকেরা।"

আমাদের ছোট্ট দুই বন্ধু রবি ও শশীকে এই ছোট্ট বইটি উৎসর্গ করা হল।

রবির জন্মস্থান

এখান থেকে অনেক অনেক দূরে, দক্ষিণ ভারতে মহীশূর নামে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ অঞ্চল আছে।

সেখানেই রবির জন্ম হয়।

রবির মা একজন কর্মজীবী হাতি। তার নাম ললিতা।

জঙ্গল থেকে ললিতাকে ধরে পোষ মানানোর পর আট বছর কেটে গেছে। তখন থেকে এই হাতিটি মানুষদের কাজে সাহায্য করে আসছে। ছোট্ট রবি প্রতিদিন তার মায়ের সঙ্গে কাজে যেত।

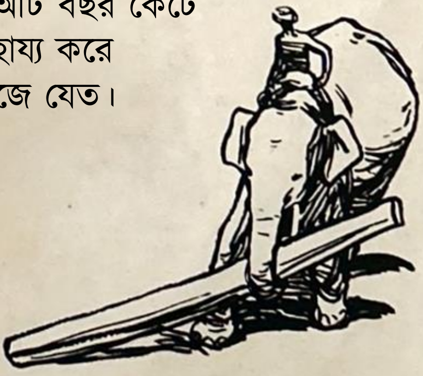

রবি এখনও নিজে কাজ করতে পারে না। সে শুধু মায়ের কাজ দেখত। ললিতা অত্যন্ত সহজে ও অনায়াসে ভারী সব কাঠের গুঁড়ি, তুলার গাঁট, পাথর এবং চালের বস্তাগুলো তুলত।

একদিন সকালে ললিতা একটি ট্রাকে আখের আঁটি তুলছিল। রবি দেখছিল তার মা কীভাবে শুঁড় দিয়ে ভারী আঁটিগুলো তুলছে, আর তখন সে নিজেও তা একটু তুলে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে তার শুঁড় দিয়ে আঁটি থেকে একটি মাত্র আখ তুলে নিল। আখের ডাঁটাটা লম্বা হওয়ায় এর এক প্রান্ত মাটিতে ঘষটে যাচ্ছিল। কিন্তু রবি আশা হারাল না। সে আখটি টেনে লরি পর্যন্ত নিয়ে গেল এবং তার মাকে দিয়ে দিল। আখটি লরিতে রাখার মতো শক্তি রবির ছিল না।

রবি সোৎসাহে ফিরে এলো। এবার সে আখের পুরো আঁটিটা তার শুঁড়ে জড়িয়ে নিল। সে একবার টানল, দুবার টানল— কিন্তু আঁটিটা এক ইঞ্চিও নড়ল না। রবি প্রাণপণে চেষ্টা করল, কিন্তু হঠাৎ তার পা টলে গেল এবং সে অল্পের জন্য উল্টে পড়ে যাওয়া থেকে রেহাই পেল।

ললিতা দেখছিল রবি কী করে। সে রবির কাছে এসে সস্নেহে তাকে নিজের শুঁড় দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে অন্যদিকে চলে গেল।

সোনা আমার, কাজ করার বয়স তোমার এখনও হয়নি!

শশীর সাথে পরিচয়

রবি খুব শান্ত ও গম্ভীর স্বভাবের। যখন তার গলায় দড়ি বেঁধে তাকে একপাশে নিয়ে যাওয়া হল, সে কোনোরকম চিৎকার চেঁচামেচি করেনি। সে মানুষের মাঝেই থাকত এবং তাদের একটুও ভয় পেত না।

রবিকে ব্যাঙ্গালোর নামক একটি শহরে আনা হয়েছিল। রেল ইস্টিশনে একটি মালগাড়ি তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

কামরাটি মাঝখান বরাবর একটি লোহার রেলিং দিয়ে ভাগ করা ছিল আর মেঝেতে ঘাস বিছানো ছিল। রবি একটি কাঠের তক্তার উপর দিয়ে হেঁটে কামরাটিতে উঠে রেলিংয়ের একপাশে দাঁড়াল। উঠেই সে তার শুঁড় দিয়ে কিছু ঘাস তুলে মুখে রাখল আর কিছু ঘাস তুলে পিঠে রাখল।

রবি যখন এই কাজে ব্যস্ত ছিল তখন সে বাইরে একটা চেঁচামেচি শুনতে পেল। কামরার দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে রবি দেখল শশী সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখল শশী নাছোড়বান্দা হয়ে প্রতিবাদ করছে এবং কিছুতেই কামরায় ঢুকতে চাইছে না

রবি অবাক হয়ে শশীর দিকে তাকিয়ে রইল। সে বোঝার চেষ্টা করছিল যে শশী কেন এত জেদ করছে আর চেঁচামেচি করছে। আসলে রবি জানত না যে শশী মাত্র কিছুদিন আগেই কুর্গের দুর্গম জঙ্গল থেকে মানুষের হাতে ধরা পড়েছে। এখনও শশী মানুষের সান্নিধ্যে অভ্যস্ত নয়। অবশেষে দুজন লোক শশীকে কামরার ভেতরে টেনে নিয়ে গেল এবং তাকে রেলিংয়ের অন্যপাশে নিয়ে দাঁড় করাল।

কামরার ভেতরটা আধো আলো আধো অন্ধকার। রবি তার প্রতিবেশীর দিকে আন্তরিকভাবে শুঁড় বাড়িয়ে দিলো। সে শশীকে হিসহিস করে ডাকল, চিঁহিঁ করে ডাকল। কিন্তু শশী তার দিকে কিছুতেই মনোযোগ দিল না। সে এক কোণে মাথা গুঁজে বসে রইল।

অবশেষে কামরাটি রেলগাড়ির সাথে যুক্ত করা হলো। ইঞ্জিনচালক হুইসেল বাজালেন এবং রেলগাড়ি চলতে শুরু করল।

শশী একটু একটু করে উঠে দাঁড়াল। সে রেলিংয়ের দিকে মাথা ঘোরাল। ট্রেনের গতি বাড়লে দুলুনি সামলে এভাবে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ানোই ভালো।

রবি কিছুক্ষণ নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে ছটফট করল, তারপর সেও রেলিংয়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

তাদের পরিচয় হল।

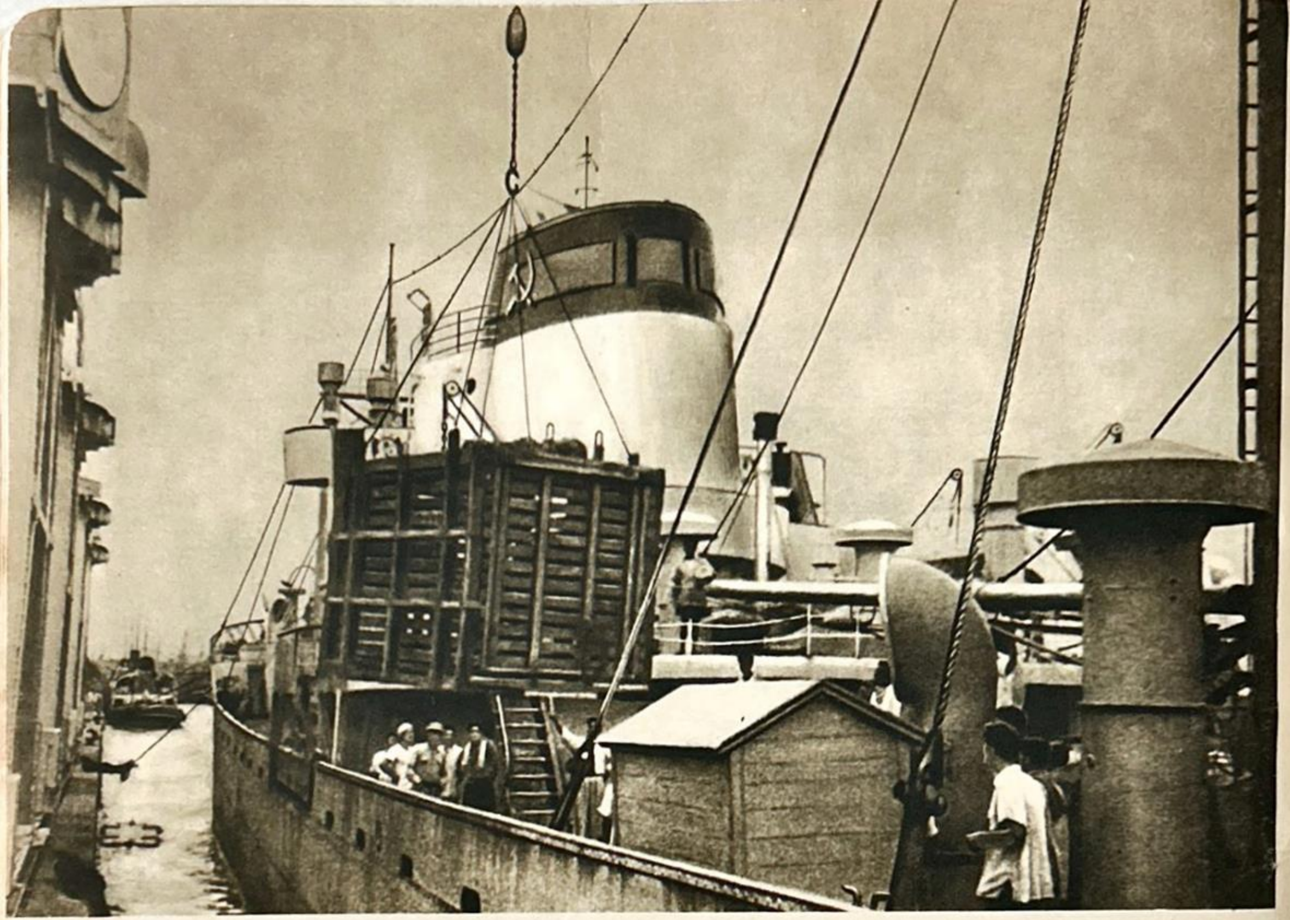

লম্বা যাত্রার আগে

পরদিন রবি ও শশী বোম্বে নামের বড় শহরে পৌঁছাল। কিন্তু যাত্রা এখনও শেষ হয়নি, যাত্রা কেবল শুরু হল। হাতিশাবকদের এখন আরও দীর্ঘ এক যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল। তাদের কামরাটিকে সমুদ্রবন্দরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং সেখানে নিরাপদে রেললাইনে তোলা হলো, এই রেললাইন ধরেই মালামাল জাহাজে ওঠে।

বন্দরে তখন করাত ও কুড়ুলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কাঠমিস্ত্রিরা রবি আর শশীর জন্য বিশেষ কাঠের খাঁচা বানাচ্ছিল। হাতির খাঁচা অবশ্যই আরামদায়ক ও প্রশস্ত হওয়া উচিত, একইসাথে সেগুলো খুব মজবুতও হওয়া চাই।

তাই খাঁচাগুলো সাধারণ কাঠ দিয়ে নয়, বরং সবচেয়ে মজবুত ভারতীয় রোজউড বা 'শিশম' কাঠ দিয়ে তৈরি করা হতো। যাকে সোজা বাংলায় আমরা চিনি 'শিশুকাঠ' নামে।

সেলাইয়ের দোকানের মেশিনগুলোও সারাদিন গুনগুন আওয়াজ করছিল। এখানে দর্জিরা রবি আর শশীকে পরানোর জন্য বিশেষ জামা মানে চাদর তৈরি করছিলেন। হাতিদের জন্য চাদরগুলো আরামদায়ক ও সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং তার চেয়েও জরুরী উষ্ণ হওয়া। তাই চাদরগুলো সবচেয়ে উষ্ণ পশমের কাপড় দিয়ে তৈরি করা হচ্ছিল। বন্দরে মাল আনা-নেওয়া করা ট্রাকগুলোর হর্ন বাজানোর তীব্র শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ট্রাকচালকেরা বন্দরে চাল ও চিনি, আখ ও দুধ, আনারস ও শুকনো ফল, কলাগাছের গোড়া, সবুজ ঘাস এবং শুকনো পশুখাদ্য নিয়ে আসছিল। বেশ! লম্বা যাত্রাপথে রবি আর শশী যেন ভালোভাবে খেতে পায়। সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবার খেয়ে তাদের যেন সুস্বাস্থ্য অটুট থাকে!

জাহাজে মালপত্র তোলা হল

সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হল। 'স্তাভরাপোল' নামক একটি সোভিয়েত জাহাজ বোম্বে বন্দরের ঘাটে এসে পৌঁছাল।

"এখন আমরা মালপত্র তোলার কাজ শুরু করতে পারি," বললেন ক্যাপ্টেন চেরনোব্রভকিন।

বিরাট খাঁচা দুটো নিয়ে দুটো ট্রাক জাহাজের কাছে এসে থামল। প্রথম ট্রাকে রবির খাঁচা, আর দ্বিতীয়টিতে শশীর।

একটি ভার-উত্তোলনকারী ক্রেন প্রথমে রবির খাঁচার দিকে ঘুরল। রবি যাতে ভয় না পায়, সেজন্য তার খাঁচাটি আগে থেকেই তেরপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল এবং ওটাকে স্টিলের দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধা হয়েছিল।

কিন্তু রবি একটুও ভয় পায়নি। উত্তোলনকারী ক্রেনটি দড়িগুলো টানতেই রবি হাঁটু মুড়ে বসে ধীরে ধীরে তার খাঁচার মেঝেতে বিছানো শুকনো ও নরম ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। খাঁচাটা সামান্য কেঁপে উঠল এবং ক্রেন খাঁচাটিকে ট্রাক থেকে তুলে নিল। খাঁচাসহ রবি ধীরে ধীরে উঠে বন্দরের ওপরের জাহাজটির কাছাকাছি হতে শুরু করল। সে কিছু ভাবার বা প্রতিক্রিয়া দেখানোর সময়ই পেল না, কারণ সে ততক্ষণে জাহাজের ডেকে পৌঁছে গিয়েছিল।

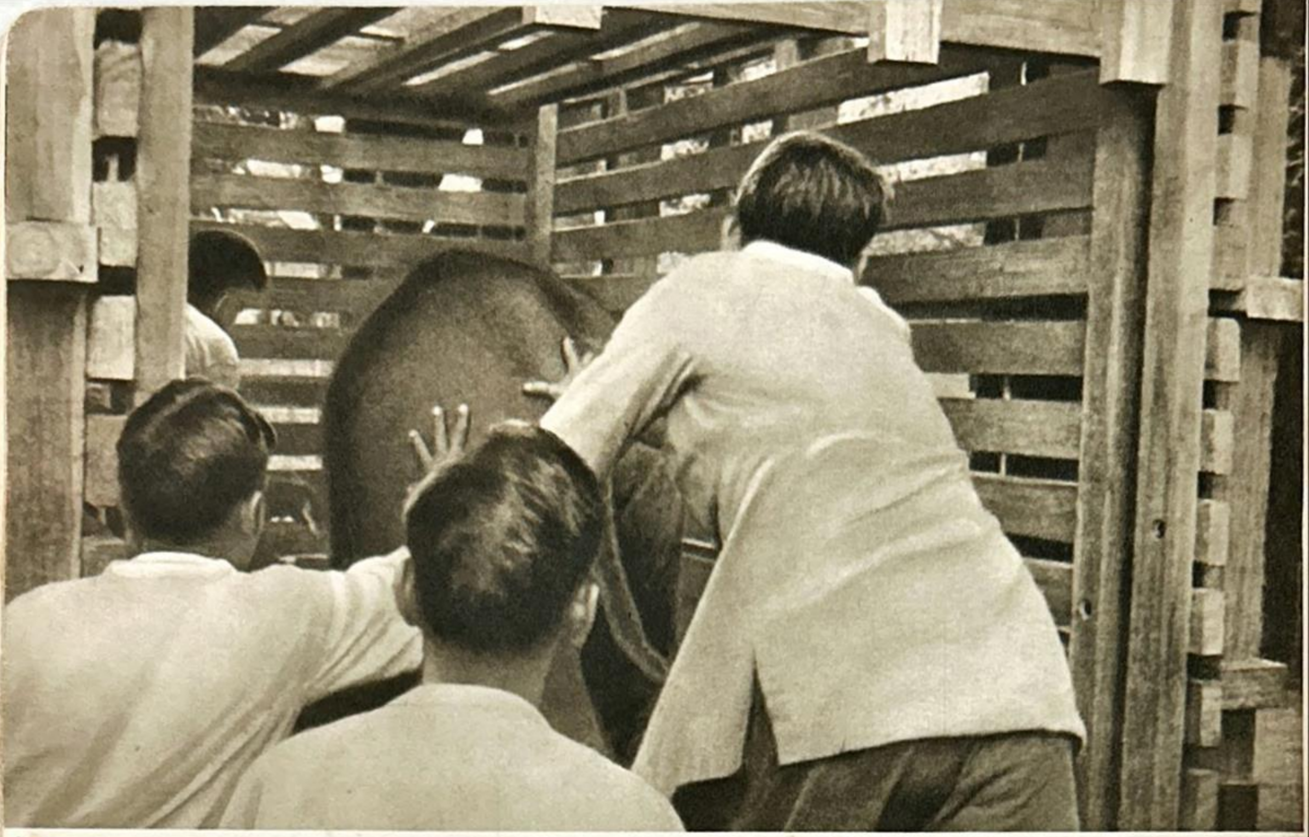

এবার শশীর পালা।

উত্তোলনকারী ক্রেনটা তার হাতের মতো হুক শশীর খাঁচায় ঢুকিয়ে দিল। চুপচাপ শুয়ে পড়ার বদলে শশী এদিক-ওদিক দৌড়ে জোরে জোরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

হঠাৎ শশী তূর্যধ্বনির মতো একটা সুরেলা আওয়াজ শুনতে পেল— শব্দটা জাহাজের ডেকের কোনও এক জায়গা থেকে আসছিল। সেটা জাহাজের হুইসেল বা চিমনির আওয়াজ ছিল না মোটেও, বরং ছিল কারো অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর, যা খুবই আপন শোনাচ্ছিল। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় শশী একেবারে চুপ হয়ে গেল, এবং তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেও জাহাজের ডেকে পৌঁছে গেল।

কিন্তু জাহাজের তূর্যধ্বনিটি কোথা থেকে এসেছিল?

হাতির খাঁচাগুলো ডেকের বাঁ দিকে রাখা হয়েছিল।

নাবিকেরা যখন তাদের খাঁচাগুলো থেকে তেরপল সরাল, রবি আর শশী ডানে-বামে তাকিয়ে তাদের সহযাত্রীদের দেখতে পেল। তারা ছিল 'বাক জাপ' আর 'ভই কাই লন'। তারা জাহাজের অপর পাশের ডেকে বড় বড় লোহার খাঁচার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের ছোট্ট দুই হাতিশাবকের দিকে শুঁড় বাড়িয়ে দিচ্ছিল। আমরা যেমন বন্ধুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিই।

"দেখেছ তো! তোমরা দুজন এখানে একা নও," ক্যাপ্টেন চেরনোব্রভকিন ছোট্ট হাতিদের বললেন।

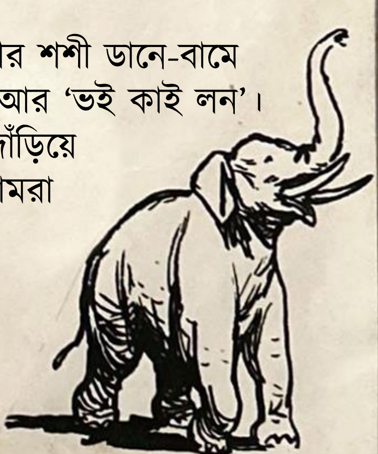

বাক জাপ এবং ভই কাই লন হলো ভিয়েতনামের হাতি। এবং যদি আমরা তাদের নাম অনুবাদ করি আমরা দেখতে পাবো বাক জাপ মানে ‘সাদা থাবা’ এবং ভই কাই লন মানে ‘বড় মা-হাতি’।

এই তো মাত্র কিছুদিন আগের কথা। তাদের মাতৃভূমি ভিয়েতনামে যুদ্ধ চলছিল। দেশের মানুষ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছিল। বাক জাপ এবং ভই কাই লনও এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। দিনরাত জলাভূমি ও দুর্ভেদ্য জঙ্গল ডিঙ্গিয়ে তারা যুদ্ধরত গণসেনাবাহিনীর জন্য গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র এবং খাবার নিয়ে আসত। ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক ও কর্মকর্তারা সস্নেহে তাদের ‘কমরেড’ বলে ডাকত।

ভিয়েতনাম থেকে হাতিদের সাথে জাহাজে যারা এসেছেন তারাও এই হাতিগুলোকে ‘আমাদের সহযোদ্ধা’ বা ‘কমরেড’ বলে ডাকেন। তারা নিজেরাও গণসেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং এই হাতিদের পাশাপাশি যুদ্ধ করেছিলেন।

যদিও রবি আর শশী এসব কিছুই বুঝতে পারেনি। এমনকি তারা এটাও জানত না যে ‘স্তাভরাপোল’ জাহাজটি ভিয়েতনামের জনগণের পক্ষ থেকে সোভিয়েত জনগণের জন্য উপহার হিসেবে বাক জাপ আর ভই কাই লনকে নিয়ে আসছিল। কিন্তু নিজেদের আশেপাশে এই বিশাল হাতিগুলোকে দেখে রবি আর শশী অবশ্যই সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়েছিল। অবশেষে জানা গেল সেই তূর্যধ্বনি যা রবি ও শশী জাহাজে ওঠার সময় শুনেছে তা ছিল এই দুই হাতির গলার আওয়াজ! বড় হাতিগুলো ছোটদের নিয়ে চিন্তিত ছিল, তাই তারা তাদের স্বভাবসুলভ তূর্যধ্বনিতে তাদের অভয় দিচ্ছিল। হাতির এই তীব্র তূর্যধ্বনি বা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ভাষাকে আমরা বলি বৃংহতি।

শুভ সমুদ্র যাত্রা!

সন্ধ্যা নাগাদ সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হল। রবি ও শশীর খাঁচাগুলো ডেকে শক্ত করে বাঁধা হল এবং তাদের খাবারদাবার জাহাজের ভূগর্ভস্থ কক্ষে রাখা হল। “অবাক হবেন না — দুটো ছোট হাতির যত্ন নিতে সত্যি সত্যি অনেকগুলো মানুষের প্রয়োজন হয়,” ক্যাপ্টেনকে বললেন ডাক্তার সর্দার খান। তিনি ভারতের একটি চিড়িয়াখানার প্রধান পরিদর্শক ছিলেন।

তাঁদের সঙ্গে পশুচিকিৎসক ডঃ রাও এবং মহীশূর চিড়িয়াখানার কর্মচারী মুহাম্মদ হাশিম ও পীর পাশা 'স্তাভরাপল' জাহাজে আরোহণ করলেন।

ডাঃ রাও বলেছেন, “রবি আর শশী তোমাদের যথেষ্টই ঝামেলায় ফেলেছে। এখন থেকে যাত্রাপথে আমরা সবাই মিলে হাতিদের দেখাশোনা করব। আমরা ওদের খাওয়াব এবং ওদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেব। জনাব নেহরুর উপহারটি যেন নিরাপদে সোভিয়েত শিশুদের হাতে পৌঁছায় তা খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি।”

অবশেষে স্তাভরাপোল জাহাজটি বোম্বে বন্দর ছাড়তে যাচ্ছিল। বহু লোক বন্দরে জড়ো হয়েছিল। জাহাজের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছিল তারা।

"যাত্রা শুভ হোক, সফল হোক!" দর্শকরা চিৎকার করে বলল।

"ধন্যবাদ!" সোভিয়েত নাবিকেরা তাদের ভারতীয় বন্ধুদের জবাব দিল।

"স্পাসিবা! স্পাসিবা! ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!"—ডাঃ খান, ডাঃ রাও, হাশিম ও পাশা বারবার বললেন। সোভিয়েত জাহাজে যাত্রা করা ভারতীয়রা প্রথম যে রুশ শব্দটি শিখেছিল তা হলো ‘স্পাসিবা’।

সেই সন্ধ্যায় 'স্তাভরাপোল'-এর ডায়েরিতে নিম্নলিখিত বিবরণটি লেখা হয়েছিল:

"বোম্বে। শুক্রবার। ৫ই আগস্ট ১৯৫৫। দুটি হাতি জাহাজে ওঠানো হয়েছে এবং সেই সাথে চারজন তত্ত্বাবধায়ক জাহাজে উঠেছেন। গন্তব্যস্থল ওডেসা বন্দর।"

একটি ভাসমান চিড়িয়াখানা

আগে 'স্তাভরাপোল' ছিল আর দশটা জাহাজের মতোই একটি সাধারণ জাহাজ, কিন্তু এখন তা একটি পুরোদস্তুর চিড়িয়াখানায় পরিণত হয়েছে। বেশিরভাগ চিড়িয়াখানায় একটি হাতি খুঁজে পাওয়াই কঠিন, কিন্তু স্তাভরাপোলে ছিল একেবারে জলজ্যান্ত চারটি হাতি, দুটি বড় আর দুটি ছোট!

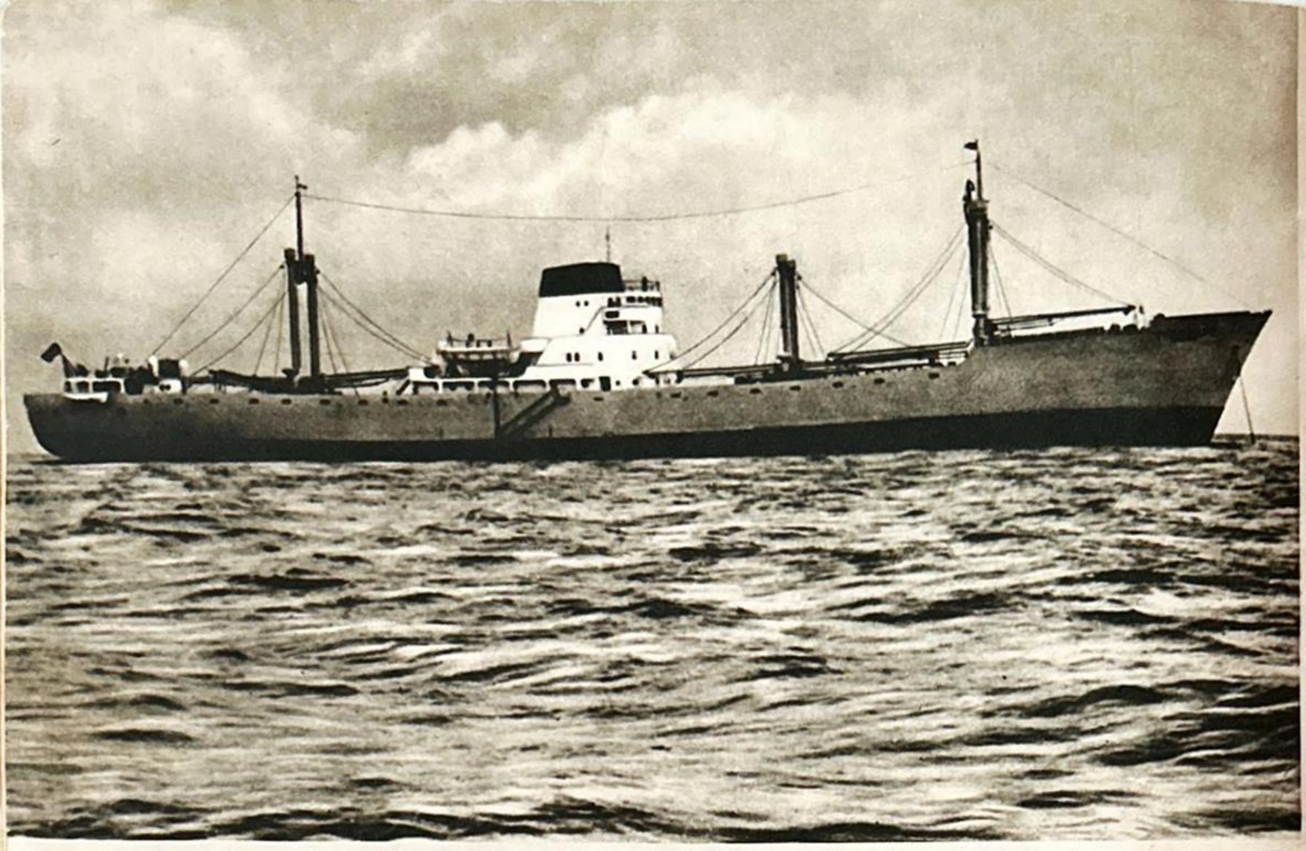

কিন্তু বাক জাপ, ভই কাই লন, রবি এবং শশী ছাড়াও জাহাজে ভ্রমণকারী ভিন্ন প্রজাতির আরও কয়েকজন ছোট যাত্রী ছিল। তারা হল ইয়াশকা, বোরকা, জোরকা এবং মাইকা। চারটি ছোট্ট বানর। নাবিকেরা তাদের এই নাম রেখেছিল। ভিয়েতনামীরা এই বানরগুলোকে জাহাজের নাবিকদের উপহার দিয়েছিল। এই বানরেরা ছিল খুব দুষ্টু এবং নানাবিধ ঝামেলা বাঁধাতে ওস্তাদ।

তাদের মধ্যে ইয়াশকা ছিল সবচেয়ে ঝামেলাবাজ। সে জাহাজের ডেকজুড়ে অস্থির ছুটোছুটি করত আর হঠাৎ করে কারো কেবিনে সেঁধিয়ে যেত। কেবিনে ঢুকে ভালোমানুষের মতো মুখ করে একটা বই তুলে নিত যেন সে বইটা পড়বে— আর তক্ষুনি সেটা ছিঁড়ে ফেলত। যদি একটা পেন্সিল পেত— তক্ষুনি সেটা ভেঙে ফেলত। এর ওর নাক থেকে চশমা ছিনিয়ে নিত যখন তখন— এবং সেগুলো ভেঙে না ফেলা পর্যন্ত সে শান্ত হতো না।

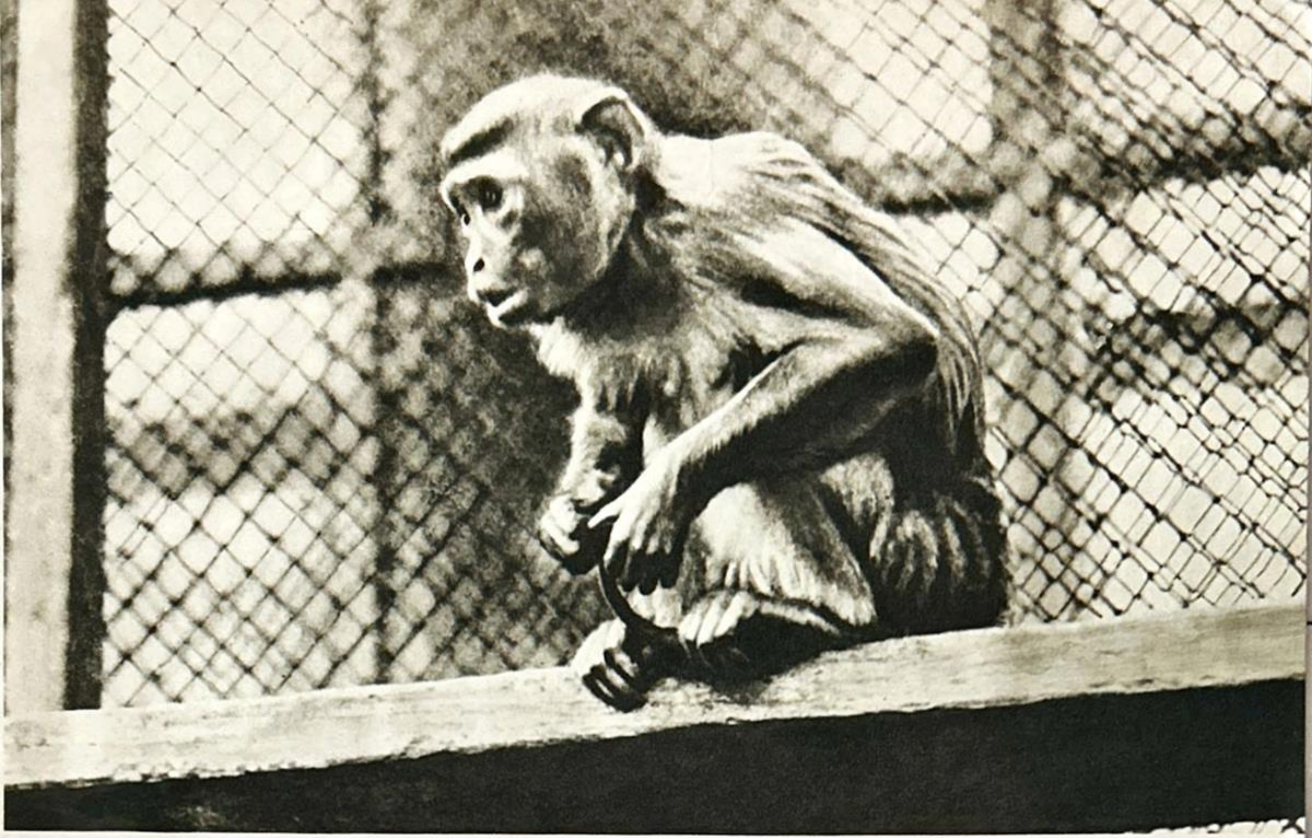

প্রতিটি কেবিনে ঢুকেই ইয়াশকা হাত ধোয়ার বেসিনে লাফিয়ে উঠত। নাবিকেরা তার এই অভ্যাসটা জেনে গিয়েছিল। তাই তারা হাত ধোয়ার বেসিনটা জল দিয়ে ভরে রাখত যাতে ইয়াশকা ইচ্ছেমতো জল ছিটিয়ে স্নান করে খুশি থাকতে পারে।

কিন্তু দুষ্টু ইয়াশকা একদিন চরম বিপদে পড়ল। সে জাহাজের ডেকে এত গোলমাল আর ছুটোছুটি করল যে আচমকা তার পা পিছলে গেল এবং সে জাহাজের রেলিং টপকে সমুদ্রে পড়ে গেল। খোলা সমুদ্রে এই অপ্রত্যাশিত পতন ইয়াশকার জন্য এক অত্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতি বয়ে আনতে পারত, যদি না সে নাবিকদের ছুঁড়ে দেওয়া মোটা দড়িটা ধরে ফেলতে পারত।

ইয়াশকার কাণ্ডকারখানা সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হতেন জাহাজের রেস্তোরাঁর ম্যানেজার গালিনা ভ্লাদিমিরভনা। তিনি রাতের খাবারের জন্য টেবিল সাজাতে না সাজাতেই ইয়াশকা হাজির হয়ে প্লেট থেকে ডিম চুরি করত, নয়তো মিষ্টি চুরি করত, কিংবা মাখন লাগানো পাউরুটি নিয়ে পালিয়ে যেত।

কিন্তু একদিন ইয়াশকা খুব দুষ্টুমি করল। সে নিজের সারা গায়ে ট্যালকম পাউডার ছিটিয়ে দিল, তারপর গালিনা ভ্লাদিমিরভনার লিপস্টিক চুরি করে কেবিনের সব দেয়াল রঙ করে দিল।

হ্যাঁ, খাঁচার ভেতরে থাকা রবি আর শশী বানরদের এই সব দুষ্টুমি দেখতে পারছিল না। ইয়াশকা, বোরকা, জোরকা আর মাইকা বড় হাতির মতোই ছোট হাতিদেরও ভয় পেত। তাই পুরোটা যাত্রাপথে তারা জাহাজের ডেকের সামনের দিকে রাখা হাতির খাঁচাগুলো থেকে দূরে দূরে থাকত। ইয়াশকা, বোরকা, জোরকা আর মাইকা শুধু হাতিদেরই ভয় পেত না, বরং শিপুন বা স্‌ভিস্তকে দেখামাত্রই তারা বিদ্যুতচমকের মতো লাফিয়ে মাস্তুলের চূড়ায় উঠে যেত এবং তাদের ভয় পুরোপুরি দূর না হওয়া পর্যন্ত নিচে নামত না।

শিপুন ও স্‌ভিস্ত ছিল দুটি অজগরশাবক, যারা ভিয়েতনাম থেকে জাহাজে উঠেছিল। অজগর ভয়ঙ্কর সাপ হলেও নাবিকদের কেউই তাদের ভয় পেত না। শিপুন ও স্‌ভিস্ত তখনও শিশু এবং তারা আকারে ছোট ছিল— তারা মাত্র দুই মিটার লম্বা ছিল— এবং মানুষের জন্য তারা কোনো হুমকি ছিল না।

হ্যাঁ, যখন তারা বড় হয়ে আট বা দশ মিটার লম্বা হয়ে উঠবে, তখন ব্যাপারটা অন্যরকম হবে বটে।

কিন্তু রবি আর শশী জাহাজে ওঠার পর থেকেই অজগরগুলোর জীবন বদলে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন চেরনোব্রভকিন কড়া মানে খুবই কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন যে শিপুন আর স্‌ভিস্তকে যেন কখনো ডেকের কাছাকাছিও না আনা হয়।

"মুন্না আর মুন্নি যেন ভয় না পায়।"

ক্যাপ্টেন স্নেহভরে রবি ও শশীকে ডাকতেন মুন্না ও মুন্নি।

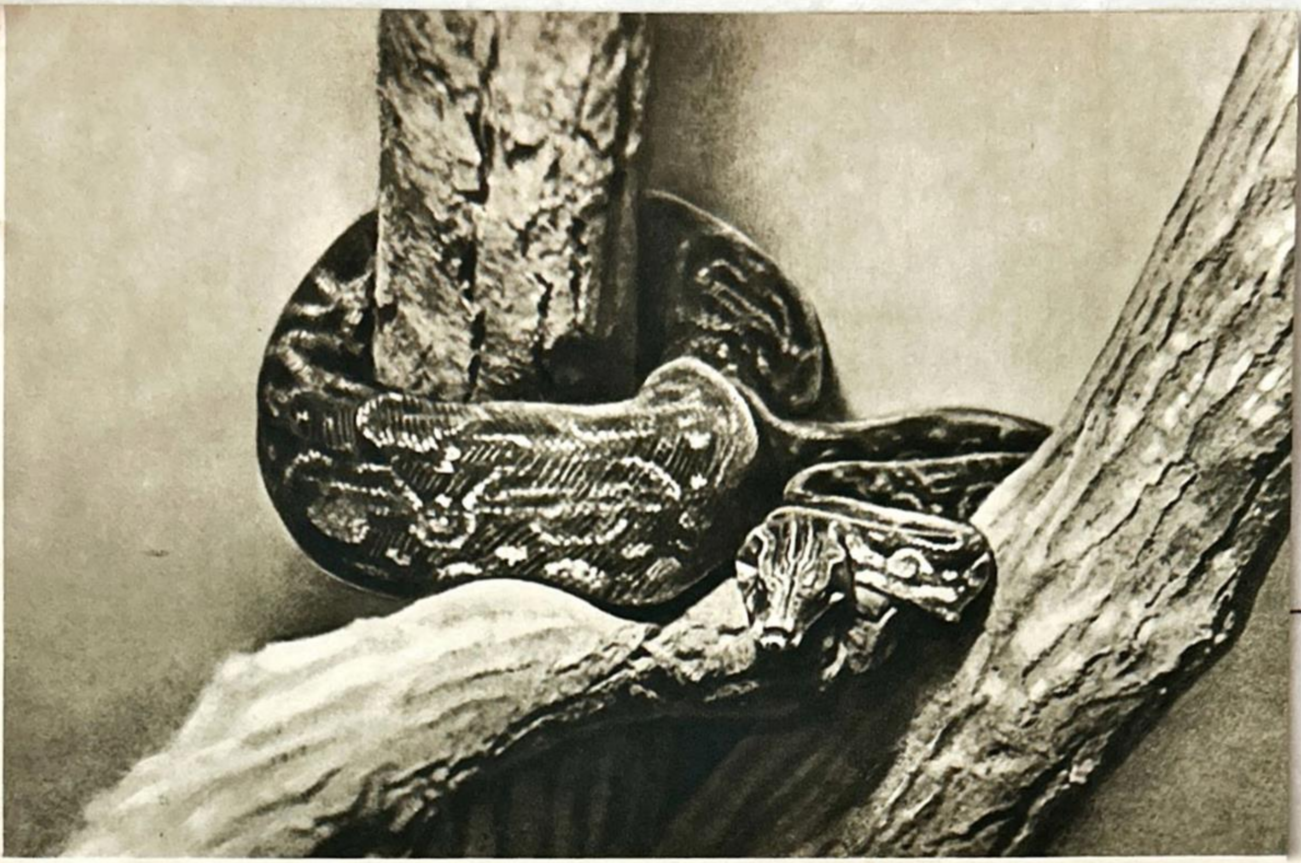

নিজ নিজ পছন্দ

ভাসমান চিড়িয়াখানাটির ছিল অনেক দর্শনার্থী। মানে নাবিকেরা তাদের ডিউটি শেষ হওয়ার পর সবাই পশুদের সঙ্গে সময় কাটাত।

আর প্রত্যেকেরই নিজস্ব আগ্রহ ছিল জাহাজের জীবজন্তুদের প্রতি। যে যার পছন্দের প্রাণীর খেয়াল রাখতেন। পেটি অফিসার সভোস্কিন বানরদের দেখাশোনা করতেন। নাবিক কোলোমিৎজ তার ভিয়েতনামী সঙ্গীদের নিয়ে হাতিদের রসালো মিষ্টি খাওয়াতেন। আর মেকানিক শকোলভ অজগর সাপ পছন্দ করতেন—তিনি তাদের খাওয়াতেন এবং নিজের কেবিনে বৈদ্যুতিক বাতির নিচের উষ্ণতায় তাদের এনে রাখতেন যাতে শিপুন আর স্ভিস্তের ঠান্ডা না লাগে।

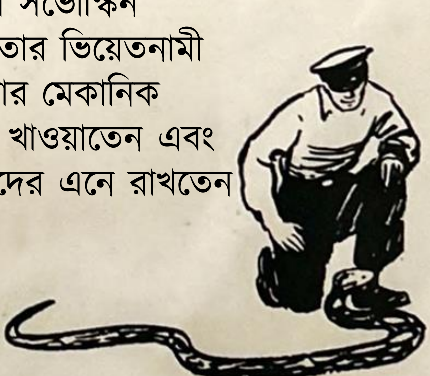

একমাত্র ক্যাপ্টেন চেরনোব্রভকিন— কর্তব্যের খাতিরে হোক কিংবা কাকে বেশি পছন্দ করেন তা স্থির করতে না পারার কারণেই হোক, সবাইকে সমান ভালোবাসতেন। জাহাজের এই অসাধারণ যাত্রীরা প্রত্যকে তাঁর প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

রবি ও শশীর খাঁচার দিকে প্রায়ই ভিড় করে দাঁড়াত জাহাজের সব দর্শক।

তখন হেঁকে বলেন তরুণ ইলেকট্রিশিয়ান শকোলভ, ""ভাইয়েরা! সবাই একসাথে বাম ডেকে জড়ো হবেন না, তাহলে জাহাজটা ডুবে যাবে!"

শকোলভ ঠাট্টা করছিলেন। খুব সম্ভবত, অন্য সবার চেয়ে তিনি নিজেই রবি ও শশীকে নিয়ে বেশি উৎসাহী ও আগ্রহী ছিলেন।

খুব ভোরে, আলো ফোটার আগেই শকোলভ হাতিগুলোর কাছে যেতেন।

"সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!" সে রবি আর শশীকে সম্ভাষণ জানাত, এবং তার মনে হতো যে ছোট্ট হাতিগুলো তার কথা বুঝতে পারছে।

রবি তার খাঁচা থেকে তার তখনও খুব ছোট আর পাতলা শুঁড়টা বাড়িয়ে দিল, এবং সামনে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা শকোলভের মুখটা সজোরে চেটে দিলো।

শকোলভ তার শুঁড়ের ভেতরে ফুঁ দিল। আর রবির তা এত ভালো লাগল যে সে হিসহিস করে উঠে সামনের পা দুটো ভাঁজ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

"সাবাস, আমার ছোট্ট হাতি!" শকোলভ আদর করে ছোট্ট হাতির ছানার শুঁড়ের কাছে মুখ গুঁজে বলল, আর রবি চুপচাপ বসে নতুন ও দুর্বোধ্য কথাগুলো শুনতে লাগল।

এরপর অন্য নাবিকেরা খাঁচার কাছে এসে একে একে রবির শুঁড়ে ফুঁ দিল আর তার সাথে কথা বলল। মনে হচ্ছিল, ওরা যখন তার সাথে কথা বলত, শশীও খুশি হতো। কিন্তু সে কাউকে তার শুঁড়ে ফুঁ দিতে দিত না, যেন সে বলতে চাইত, “যত ইচ্ছে রবির শুঁড়ে ফুঁ দাও, আমার কাছে ভুলেও এসো না! ওর যদিও এটা ভালো লাগে, আমার কিন্তু এইসব রসিকতা মোটেও ভালো লাগে না বলে রাখলাম!”

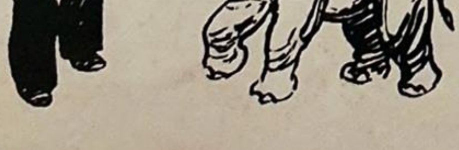

শশী তার শুঁড় গুটিয়ে নিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তার একটু মনখারাপ হচ্ছে। শুঁড় নিয়ে একটি বাজে ঘটনা ঘটে গেছে কদিন আগে, তাই সে শুঁড় নিয়ে অতো খুঁতখুঁতে।

শশী খুব কমই খাঁচার বাইরে তার শুঁড় বের করত। তবু বেমক্কা সেদিন তার শুঁড়টা তক্তাগুলোর মধ্যে আটকে গিয়েছিল আর তাতে শশী ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, কারণ সে ভেবেছিল হয়তো শুঁড়টা সে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলবে। শুঁড় ছাড়া হাতি আবার কেমন প্রাণী? কাজের প্রাণী তো নয়ই!

যখন শকোলভ শশীর কানে হাত বুলিয়ে দিল সে কোনো প্রতিবাদ করল না। তার গোল ছোট্ট চোখ দুটো আনন্দে ঝলমল করে উঠল।

রবি সবার সাথে খেলত। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার খাঁচার মধ্যে ছোটাছুটি করত, যখন সে ক্লান্ত হয়ে যেত তখন সে একপাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়ত এবং নিমিষেই ঘুমিয়ে পড়ত।

সে শুধু রাতেই নয়, দিনেও ঘুমাতো। ঘুম ভাঙলে সে তার শুঁড়টি তুলে বড় করে হাই তুলে আগ্রহ নিয়ে ডানদিকের সেই খাঁচার দিকে তাকাতো যেখানে বাক জাপ আর ভই কাই লনের খাঁচাগুলো রাখা ছিল। হয়তো আধোঘুমে রবি ওদের তার বাবা-মা বলে ভাবত, অথবা হয়তো স্বপ্নে সে নিজেকে দ্রুত বড় হতে দেখত এবং দেখত যে ওদের মতো বিশাল হাতি হয়ে উঠেছে সে।

সকালের নাস্তা এবং দুপুরের খাবার

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চারবার নাবিকদের বিশ্রামকক্ষে খাবারের টেবিল সাজানো হয়। নাবিকরা সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার, তারপর হালকা জলখাবার এবং সবশেষে রাতের খাবার খেত।

হাতিদের এত ঘন ঘন খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তাদের এক বিশেষ ধরনের দৈনন্দিন অভ্যাস এবং বিশেষ ধরনের খাবার রয়েছে।

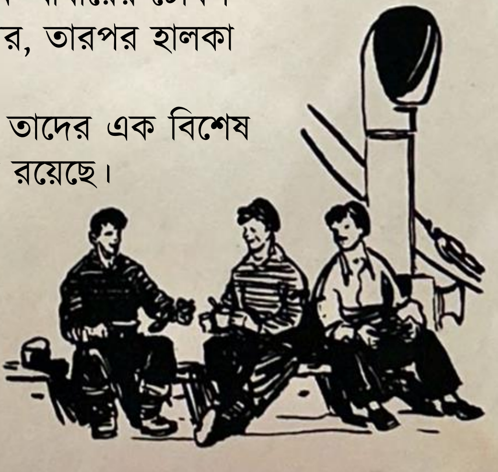

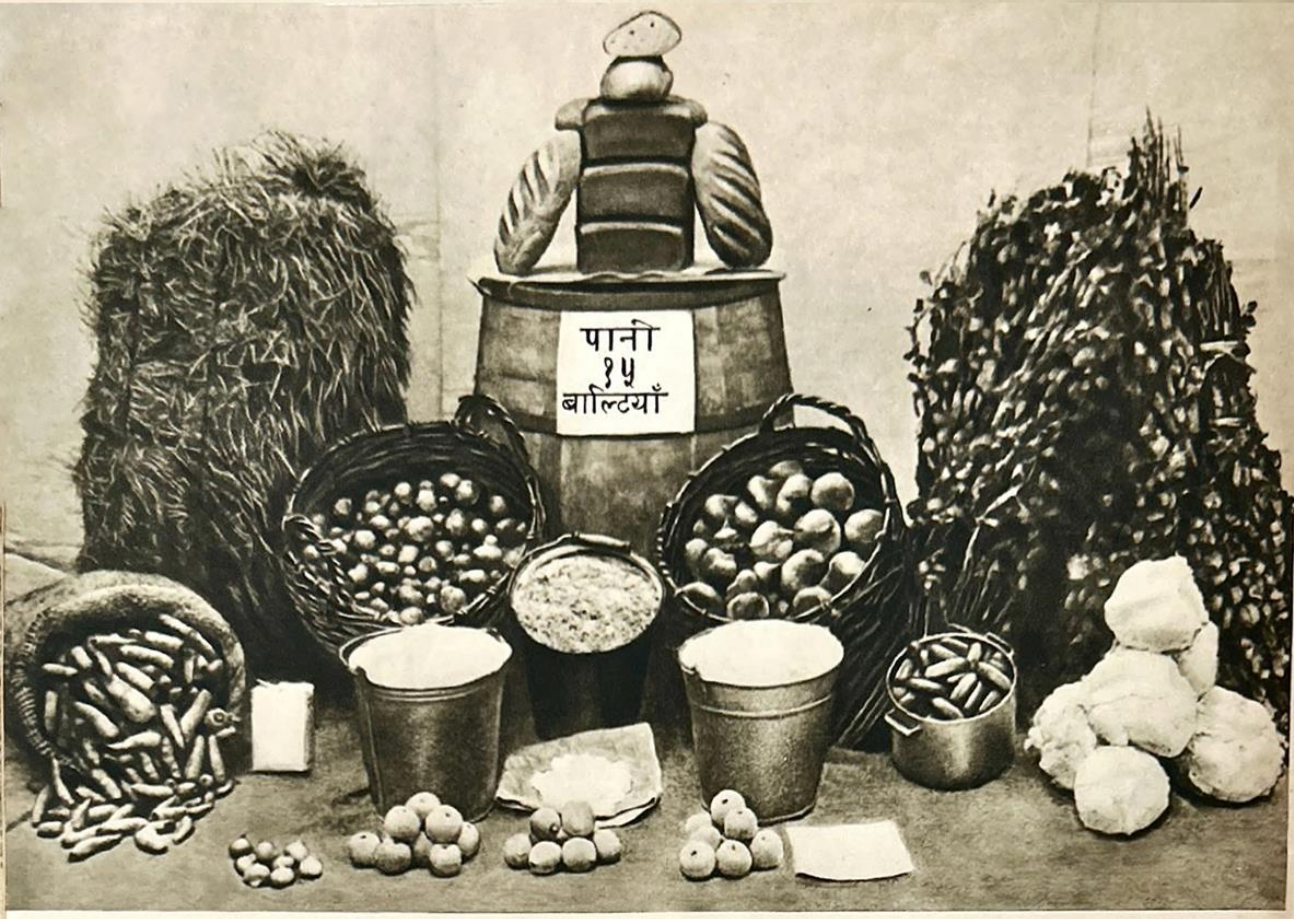

সকাল নটায় রবি ও শশী নাস্তা করে। বিকেল পাঁচটায় তারা দুপুরের খাবার খায়। যদিও রবি ও শশী তখনও খুব ছোট্ট, তবু তারা প্রত্যেকে একদিনে এত বেশি পরিমাণ খাবার খেত যা কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ খেতে পারে না।

ভোরবেলা ডঃ রাও তাঁর নোটবুকটি খুললেন। তিনি পড়লেন, "শুকনো চাল - এক কিলোগ্রাম, চিনি - আড়াইশো গ্রাম, তাজা দুধ - পাঁচশো গ্রাম, লবণ - পনেরো গ্রাম, শুকনো ঘাস - কুড়ি কিলোগ্রাম, চারটি আখ, সবুজ ঘাস ও ডালপালা - যত খুশি।" ছোট্ট হাতিকে প্রতিদিন এই সবকিছুই দেওয়া উচিত। আর বড় হাতিদের দিতে হয় আরও বেশি। দেখেছ পরিমাণটা কেমন!

রবি আর শশী ঘাস আর শুকনো পশুখাদ্য খেয়েই অনায়াসে চালিয়ে নিতে পারত। ওরা শুঁড় দিয়ে ছোট ছোট আঁটি তুলে মুখে পুরে নিত। এমনকি ওরা নিজেরাই আখ চিবিয়ে খেয়ে নিত। রবি আর শশী তাদের তত্ত্বাবধায়কের হাত থেকে সরাসরি শুঁড়ে পরিষ্কার করে কাটা আখের টুকরোগুলো নিয়ে, পরম দক্ষতায় মুখে পুরে দিত আর রস চুষে নিয়ে মিষ্টি স্বাদটা উপভোগ করত।

কিন্তু বাকি খাবারগুলো নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল।

একবার, জাহাজে ওঠার আগে, রবির সামনে এক বাটি রান্না করা ভাত রাখা হলো। রবি তার শুঁড়টা বাটিটার উপর ঝুলিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল কিন্তু ভাত তুলতে পারল না। অবশেষে মনে হলো সে তার শুঁড়ে এক মুঠো ভাত তুলেছে, কিন্তু যেইমাত্র সেটা মুখে দিতে গেল—ভাতগুলো সব ছড়িয়ে পড়ল। রবি অসন্তুষ্ট হয়ে চিৎকার করতে করতে খালি শুঁড়টা চাটতে লাগল।

এবার বাটিটা শশীর সামনে রাখা হলো। সেও তার শুঁড় ঝুলিয়ে ভাত চেঁছে খাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু খেতে পারল না।

রবি আর শশীর জন্য বাটি ভর্তি করে দুধ আনা হলো। সবাই ভাবল ওরা দুধ খেতে না করবে না, কারণ সব বাচ্চাই তো দুধ ভালোবাসে! রবি ও শশী দুধের বাটির দিকে তাকালো, কিন্তু সম্ভবত ওটা কী ধরনের তরল তা বুঝতে না পেরে নিজেদের শুঁড় ঘুরিয়ে নিল।

এটা একটা বড় বিস্ময় ছিল। দেখা গেল যে রবি আর শশী এতটাই ছোট যে তারা নিজেরা খেতে পারছে না।

কেমন করে হাতিশাবক দুটিকে সাহায্য করা যায়? তখন রান্না করা ভাতে তাজা দুধ মেশানো হলো, তারপর ওতে দানাদার চিনি যোগ করা হলো, সবকিছু একসাথে মেশানোর ফলে একটি চমৎকার পায়েস বা হালুয়া তৈরি হয়ে গেল।

মোহাম্মদ হাশিম হাতে এক মুঠো হালুয়া নিয়ে, যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সেটাকে ঠেসে ঠেসে গোল করে বলের মতো পিণ্ড বানিয়ে রবির মুখে পুরে দিল।

রবি প্রথমে বস্তুটা একটু চেখে দেখল। হালুয়াটা মিষ্টি ও সুস্বাদু ছিল। তারপর সে তার শুঁড় তুলে হালুয়ার পিণ্ডটা মুখে পুরে চিবিয়ে গিলে ফেলল।

"আমাকে আরো দাও!"

পীর পাশা হাতে এক মুঠো হালুয়া নিয়ে, যাতে পড়ে না যায় সেইভাবে আবার পিণ্ড বানিয়ে গোল করে পাকিয়ে শশীর মুখে পুরে দিলেন।

শশী হালুয়াটা চিবিয়ে গিলে ফেলল। সেও তার শুঁড়টা তুলে মুখ খুলে বলল, "আমাকে আরও দাও!"

জাহাজে রবি ও শশীকে এভাবেই খাওয়ানো হয়েছিল।

সকল নাবিক ডেকে হাজির হও!

দক্ষিণ সাগরে পড়ল জাহাজ। আবহাওয়া মোটেও সুখকর ছিল না। আগস্ট মাস জুড়ে ছিল ঝড়, ঘূর্ণিঝড় আর প্রবল বাতাস। বোম্বে যাওয়ার পথে জাহাজটি প্রচণ্ড দুলছিল। ফিরতি পথেও সেই একই দুলুনি।

জাহাজের দুলুনিতে বড় হাতিগুলোর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। রবি ও শশীর অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। তাদের খাঁচাগুলো তেরপল দিয়ে ঢাকা থাকলেও, চারদিক থেকে ছোট হাতিগুলোর ওপর বৃষ্টির ধারা অবিরাম এসে পড়ছিল। সমুদ্রের জল ছিল নোনা, আর হাতিদের চামড়া যতই পুরু হোক না কেন সেই লবণের কারণে তাতে চুলকানি ও ব্যথা হচ্ছিল। ক্যাপ্টেন চেরনোব্রভকিন বিষয়টি লক্ষ্য করলেন এবং তাই জাহাজটিকে বাতাসের বিপরীত দিকে কোনাচে করে চালনা করার চেষ্টা করলেন, যাতে ঢেউগুলো পাটাতনে না পড়ে জাহাজের সামনের অংশে আছড়ে পড়ে।

জাহাজটি তার ধারালো তলা দিয়ে ঢেউ কেটে এগিয়ে গেল এবং জলের ছিটকে আসা জল ডেকে না পড়ে অন্য দিকে ছিটকে গেল।

জাহাজটি আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের সীমান্তে অবস্থিত এডেন উপসাগরে প্রবেশ করতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু করল। সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছিল এবং ঝড় আগের চেয়েও তীব্র হচ্ছিল। হঠাৎ একটি বিশাল ঢেউ জাহাজে আছড়ে পড়ল এবং ডেকের মেঝেতে আছড়ে পড়ে বাম দিকটা ভাসিয়ে নিলো। ঠিক সেই মুহূর্তে শশীর আর্তচিৎকারের সাথে কাঠ ভাঙার একটা বিচ্ছিরি শব্দ শোনা গেল।

আপাদমস্তক ভিজে শশী এক কোণে কোনোমতে দাঁড়িয়েছিল। সে একটু লুকোবার জায়গা খুঁজছিল। আর সেখান থেকে ভীত চোখে তাকিয়ে ছিল তার খাঁচার ভাঙা দরজার দিকে। ঢেউয়ের প্রবল আঘাতে যা ভেঙে গিয়েছিল।

"সকল নাবিক ডেকে ওঠো!" জাহাজে ক্যাপ্টেন চেরনোব্রভকিনের আদেশ শোনা গেল।

সব নাবিকেরা ডেকে ছুটে গেল।

"অবিলম্বে ভাঙা দরজাটা মেরামত করো, এবং খাঁচাগুলো আরও মজবুত করো!" ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিলেন।

নাবিকেরা কাজ শুরু করল।

কয়েক ঘণ্টা ধরে করাত আর কুড়ুল চলতে থাকল, শিকলগুলো ঝনঝন করে উঠতে থাকল। নাবিকেরা দারুণ পরিশ্রম করে শশীর খাঁচার বেঁকে যাওয়া তক্তাগুলো সোজা করল এবং ভাঙা দরজাটা মেরামত করল। আর ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য এবার তারা সাধারণ তালার পরিবর্তে লোহার শিকল দিয়ে খাঁচার দরজাগুলো আটকে দিল।

শশী কেমন করে ভালো হয়ে গেল

প্রত্যেক ডাক্তারেরই রোগী পরীক্ষা করার জন্য নানারকম চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়। ডাক্তার রাওয়ের কাছেও অমন অনেক চিকিৎসা সরঞ্জাম ছিল। কিন্তু ডাক্তার রাও কোনো সাধারণ ডাক্তার ছিলেন না তাই তাঁর সরঞ্জামগুলোও সাধারণ মাপের ছিল না, সেগুলো ছিল আকারে অনেক বড়। ডাক্তার রাও পশুদের চিকিৎসা করতেন। রবি ও শশী ছিল তাঁর রোগী।

ডাক্তার রাও স্টেথোস্কোপ দিয়ে হাতির বাচ্চাদের শুঁড়ের শব্দ শুনতেন, থার্মোমিটার দিয়ে তাদের শরীরের তাপমাত্রা মাপতেন, তাদের কাশি বা সর্দি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতেন। পুরো যাত্রাপথে ডাক্তার রাও খুব চিন্তিত ছিলেন। এবার হঠাৎ নতুন এক দুশ্চিন্তা দেখা দিল। জাহাজের অতিরিক্ত দুলুনির কারণে শশী অসুস্থ হয়ে পড়ল।

শশী খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিল। চার দিন চার রাত ধরে সে তার খাঁচায় শুয়ে ছিল। হয় সে ঝিমাচ্ছিল, নয়তো নিজের শুঁড় চুষছিল।

ডাক্তার রাও তাঁর ওষুধের বাক্সে রাখা চিকিৎসা সরঞ্জাম থেকে একটি বড় ইনজেকশন বের করে তাতে গ্লুকোজ ভরে শশীর কাছে নিয়ে এলেন।

শশী জীবনে এই প্রথমবারের মতো ইনজেকশন দেখেছিল, আর সব বাচ্চাদের মতোই সেও খুব ভয় পেয়েছিল। কিন্তু আসলে ইনজেকশন ততটা ভয়ের ছিল না। শশী চিৎকার করে উঠল, কিন্তু ডক্টর রাও চটজলদি খালি ইনজেকশন যন্ত্রটা লুকিয়ে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলেন।

সন্ধ্যায় দ্বিতীয় ইনজেকশন দেওয়ার সময় শশী আবার চিৎকার করে উঠেছিল।

কিন্তু পরদিন সকালে ডাক্তার যখন এলেন তখন সে খুব শান্ত ও স্থির ছিল। তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। শশী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল এবং সে দেখল যে খাঁচার মেঝেটা আগের মতো কাঁপছে না। সে সমুদ্রের দিকে তাকাল। সমুদ্র শান্ত হয়ে গিয়েছিল এবং জাহাজের ডেকে সমুদ্র আর ঢেউ ছিটিয়ে দিচ্ছিল না। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে প্রথমবারের মতো শশীর মাথার ওপরের নীল আকাশটুকু ঝলমলে সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

তখন স্তাভরাপোল জাহাজটি লোহিত সাগরের শান্ত জলে চলছিল।

রবি ও শশীর চতুরতা

লোহিত সাগরে কোনো প্রবল বাতাস বা ঝড় ছিল না। কিন্তু আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড গরম— চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস! দক্ষিণের গনগনে সূর্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝলসে দিচ্ছিল সব। জাহাজের লোহার পাটাতন পায়ের নিচে গরম কড়াইয়ের মতো উত্তপ্ত হয়ে ছিল।

রবি ও শশীর খাঁচাগুলো আবার তেরপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। তবু হাতিশাবকদের গরম লাগছিল খুব। ওরা বারবার শুঁড় বাড়িয়ে জল চাইছিল। প্রাণ ভরে জল খাওয়ার পর রবি ও শশী নিজেদের ঠান্ডা করার জন্য পিঠেও জল ঢালত।

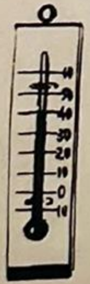

তাপপ্রবাহ তিন দিন ধরে চলল। লোহিত সাগরে প্রচুর জল থাকলেও সেই নোনাজল পানের উপযুক্ত নয়। ট্যাঙ্কগুলোর সুপেয় মিষ্টি জল ধীরে ধীরে কমে আসছিল, আর সৈয়দ বন্দর তখনও অনেক অনেকটা দূরে। বোম্বে ছাড়ার পর ওটাই ছিল প্রথম বিরতিস্থল। সেখানে পৌঁছালে মিঠাপানির ট্যাঙ্কগুলো আবার ভরে নেওয়া সম্ভব হবে।

ক্যাপ্টেন আদেশ দিলেন, "মিষ্টি জল বাঁচাও। তা শুধু খাবার তৈরি ও পান করার জন্য রাখো!"

এর মানে হলো রবি ও শশী তাদের পিঠে জল ছিটাতে পারবে না। তাদের কয়েকদিন কষ্ট সহ্য করতে হবে।

সকালের নাস্তার পর মোহাম্মদ হাশিম ও পীর পাশা হাতির বাচ্চাগুলোর জন্য সাধারণত যে পরিমাণ পানি আনতেন, তার অর্ধেক এনেছিলেন। রবি আর শশী সব পানি খেয়ে ফেলায় স্নানের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

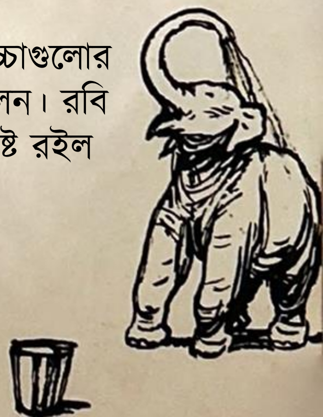

দুপুরের খাবারের সময় হলো এবং ভারতীয় কর্মচারীরা আবার হাতিদের জন্য পানীয় জল নিয়ে এলো। কিন্তু কোনো এক কারণে রবি যথারীতি জল পান না করে, পুরোটাই নিজের পিঠে ঢেলে দিল। শশীও ঠিক তাই করল। গায়ে জল ঢেলে বালতি খালি করে হাতিগুলো তাদের শুঁড় বাড়িয়ে মোহাম্মদ হাশিম এবং পীর পাশার দিকে ধূর্ত দৃষ্টিতে তাকাল।

"আমাদের আরও জল দাও! এবার আমরা জল খাবো!"

মোহাম্মদ হাশিম ও পীর পাশা কীইবা করতে পারতেন? তাঁরা খালি বালতিগুলো তুলে নিয়ে আবার পানি আনতে গেলেন।

হাতিদের খাবার পানি থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

"কী চালাক!" ক্যাপ্টেন চেরনোব্রভকিন অবাক হয়ে ভাবলেন। ছোট্ট হাতিরা কৌশলে দেখছি ক্যাপ্টেনের থেকেও চৌকস!

রবি আর শশী তাদের শুঁড়গুলো সদ্য ভরে আনা জলের বালতিগুলোতে ডুবিয়ে রেখেছিল। প্রাণভরে নিজেদের গায়ে জল ছিটিয়ে নেওয়ার পর তারা এখন খুব উৎসাহের সাথে পানি খাচ্ছিল।

রবির কী হয়েছে?

জাহাজটি সুয়েজ খালের কাছে পৌঁছল। সেখানে তারা একটি বাধার সম্মুখীন হলো। সামনে থাকা দুটি বিদেশি জাহাজ হঠাৎ থেমে গেল। ফলে স্তাভরাপোলকে থামতে হলো।

সুয়েজ খাল একেবারেই প্রশস্ত নয়। দুই বা তিনটি বড় জাহাজের পাশাপাশি চলাচল করার কোনো উপায় নেই।

জাহাজটা থামতেই ডেক থেকে একটা কানে তালা লাগানো বিকট চিৎকার শোনা গেল। ওটা ছিল রবির চিৎকার। সে তার খাঁচার মধ্যে এদিকওদিক ছোটাছুটি করছিল আর তার শুঁড়টা কখনও বামে কখনও ডানে টানটান করে ধরে রাখছিল।

ভারতীয় তত্ত্বাবধায়করা তার খাঁচার দিকে ছুটে গেল। ডাক্তার রাও খাঁচায় ঢুকে হাতিটিকে পিঠ চাপড়ে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রবি এমনভাবে চিৎকার করতে থাকল যেন কেউ তাকে ছুরি মারছে।

কিছুক্ষণ পর সামনে থেমে থাকা জাহাজগুলো চলতে শুরু করল। স্তাভরাপোলও চলতে শুরু করল। ঠিক সেই মুহূর্তে রবি চিৎকার করা থামিয়ে দিল যেন কিছুই হয়নি, আর ঘাস খেতে শুরু করল। কয়েক ঘণ্টা পর জাহাজটাকে ফের থামতে হলো, আর ঠিক তখন ফের শুরু হলো রবির গগনবিদারী চিৎকার।

"রবির কী হয়েছে? ও কি অসুস্থ হয়ে পড়েছে?" ডাক্তার রাও চিন্তিত হলেন।

যখন স্তাভরাপোল সুয়েজ খাল থেকে বেরিয়ে এসে সৈয়দ বন্দরের একটি ঘাটে নোঙর করল তখন রবির আর্তনাদ আবার শোনা গেল। সে বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে একটানা চিৎকার করে চলল। সাহায্যের জন্য ডাকার মতো খুব করুণ স্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল সে এবং একই সাথে তার শুঁড়টি ডাঙার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। অবশেষে সবাই রবির দুর্দশার কারণটা বুঝতে পারল। যতবারই জাহাজটা থামত সে ভেবে নিত যে যাত্রা শেষ হয়ে গেছে এবং সে করুণ গলায় ডাঙায় যাওয়ার অনুমতি চাইত। আসলে আমাদের ছোট্ট রবি দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

সবাই ডেকে জড়ো হও আবার!

একদিন সকালে আবার আদেশটি শোনা গেল:

“সকল নাবিকেরা ডেকে ওঠো!”

যেসব নাবিকেরা পাহারায় ছিল না তারাও ছুটে এল ডেকে। আবার কি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটল?

ভূমধ্যসাগর শান্ত। জাহাজের ডেকেও শান্তি বিরাজ করছিল। পশুর খাঁচাগুলো যথাস্থানে ছিল। হাতিগুলো দিব্যি তরতাজা ও সুস্থ। তাহলে সমস্যাটা কী?

"আজ স্নানের দিন," ক্যাপ্টেন চেরনোব্রভকিন ব্যাখ্যা করলেন, "আজ পশুদের ঘষেমেজে স্নান করানো হবে।"

ডেকে একটি গভীর পাত্র আনা হলো এবং গরম জলে কানায় কানায় পূর্ণ করা হলো।

"চলো, বানরেরা! জলে ঝাঁপ দাও!"

ইয়াশকা সবার আগে জলে ঝাঁপ দিল। সে যখন জল ছিটানো আর ডুব দেওয়া চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন অন্য বানরগুলো দূরে বসে দেখছিল। তারা জলের কাছে আসার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না। ঠিক তখনই জুনিয়র অফিসার সাভোস্কিন এসে পৌঁছালেন। তিনি ইয়াশকার সামনের থাবা ধরে তাকে টেনে তুললেন, "তোমার যথেষ্ট স্নান করা হয়েছে, আর নয়!"

বোরকা, জোরকা ও মাইকা এরই অপেক্ষায় ছিল। তারা ছুটে নৌকাটির দিকে গেল এবং ধপাস করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ইয়াশকা রাগে চিৎকার করে উঠল। কোনোমতে সাভোস্কিনের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে স্নানের পাত্রের দিকে ছুটে গেল এবং তড়িৎ গতিতে একেবারে কিছু না ভেবেই অন্য বানরগুলোকে পানিতে ডোবানোর চেষ্টায় সে তাদের ওপর ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করল।

জুনিয়র অফিসার সাভোস্কিন আবার ইয়াশকাকে স্নানের পাত্র থেকে টেনে তুলে নিয়ে গেলেন।

ঠিক যখন জাহাজের বাম দিকে বানরদের নিয়ে এই মজার ঘটনাগুলো ঘটছিল, রবি আর শশী তখন নিজেদের মতো করে স্নান করছিল। ইলেকট্রিশিয়ান শকোলভ আগুন নেভানোর মোটা পাইপ দিয়ে তাদের ওপর জল ঢালছিল।

কোনো এক অজানা কারণে রবি পানিকে ভয় পাচ্ছিল। সে তার খাঁচার ভেতরে লাফাচ্ছিল, চিৎকার করছিল। সামনের পা দুটো দেওয়ালে ঠেকিয়ে এবং শুঁড়টা গুটিয়ে পানির স্রোত থেকে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করছিল।

শশীর আচরণটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে চিৎকার করছিল না, কোণায় লুকোনোর চেষ্টা করছিল না বা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছিল না, বরং খুব শান্তভাবে ডানেবামে ঘুরতে ঘুরতে জলের তোড়টা উপভোগ করছিল।

মনে হচ্ছিল শশী স্নান করতে খুউব ভালোবাসে।

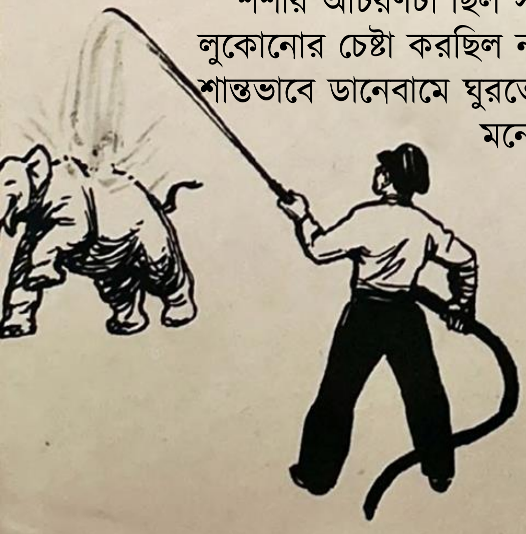

জাহাজ নোঙ্গর করল

রবি ও শশী জাহাজে ওঠার পর ষোলটি দিন ও রাত কেটে গেল। অবশেষে স্তাভরাপোল ওডেসা বন্দরে এসে পৌঁছাল। যাত্রীদের নামার সময় হয়ে গিয়েছিল। বোম্বের মতো এখানেও জাহাজের পাশে একটি বিশাল উত্তোলনকারী ক্রেন রাখা হয়েছিল।

ডেকে সবকিছু প্রস্তুত ছিল। নাবিকেরা বাক জাপ ও ভই কাই লন-এর খাঁচাগুলো খুলে দিয়েছিল এবং ভিয়েতনামী মাহুতরা তাদের হাতির পিঠে নিজেরাও উঠে বসেছিলেন।

এমন সময়ে হাতিগুলোকে একা রেখে যাওয়া অসম্ভব— নামানোর সময় ওরা ভয় পেয়ে খাঁচাগুলো ভেঙে ফেলতে পারে, তাহলে এই যাত্রার সবার কষ্টই মাটি হবে। জাহাজ থেকে সবার প্রথমে বাক জাপকে নামানো হল। উত্তোলনকারী ক্রেনটি তার খাঁচাটি ডেক থেকে তুলে বন্দরের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করল। মনে হচ্ছিল সবকিছু ঠিকঠাকই চলছে। বাক জাপ তার খাঁচায় শান্তভাবে দাঁড়িয়ে ছিল এবং কেবল তার শুঁড়টি ধীরে ধীরে এদিক-ওদিক নাড়ছিল।

ধীরে ধীরে ক্রেনটি বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটির দিকে ঘুরল, ক্রেন চালক খাঁচাটি প্ল্যাটফর্মে নামানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ খাঁচার তলাটা নিচ থেকে একটুখানি ভেঙে গেল এবং হাতিটির সামনের ডান-পা সেই ভাঙা অংশ দিয়ে বেরিয়ে বাতাসে ঝুলতে শুরু করল। ক্রেন চালক সঙ্গে সঙ্গে মোটরটি বন্ধ করে দিলেন, এবং বাক জাপের খাঁচাটি প্ল্যাটফর্মের উপরে বাতাসে ঝুলছিল।

এখন কী করা উচিত? খাঁচাটা প্ল্যাটফর্মে নামানো হলে হাতির ঝুলে থাকা পা থেঁতলে যেতে পারে। কিন্তু বাক জাপকে এভাবে বাতাসে ঝুলিয়ে রাখাও বিপজ্জনক। ভীত হাতি দিগ্বিদিক হারিয়ে শেষ অব্দি খাঁচার গোটা মেঝেটাই ভেঙে ফেলতে পারে এবং এর ফলে ভয়াবহ কিছু ঘটতে পারে।

বোঝা গেল যে ভিয়েতনামী মাহুতরা হাতির পিঠে অকারণে বসে ছিলেন না। মাহুত বাক জাপের গলা দু'হাতে তুলে, অত্যন্ত স্নেহভরে তার দিকে তাকিয়ে পা তুলতে ইশারা করল। বাক জাপ যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হয়ে ধীরে ধীরে তার সামনের পা দুটো তুলল এবং ঠিক সেই মুহূর্তে খাঁচাসহ নিজেকে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে আবিষ্কার করল।

এবার ভই কাই লনের পালা ছিল। বাক জাপের সাথে কী ঘটেছিল তা দেখে এই মাদী হাতিটি আত্মরক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যখন উত্তোলনকারী ক্রেনটি ভই কাই লনকে ডেক থেকে তুলল সে তার শুঁড় বাড়িয়ে দিয়ে খাঁচার মেঝেটিকে আঁকড়ে ধরল। মাদী হাতিটিকে প্ল্যাটফর্মে নামানোর আগে খাঁচাটিকে কয়েক মিনিটের জন্য বাতাসে ধরে রাখতে হয়েছিল যাতে তার শুঁড়টা আঘাত না পায়। কাই লন সহজে খাঁচার নিচ থেকে তার শুঁড়টা বের করতে চাইছিল না।

তবে রবি আর শশী সাহসী হাতি হিসেবে অভিহিত হলো। ওদের নামাতে কোনো কষ্টই হলো না। উত্তোলনকারী ক্রেনটি ওদের খাঁচাগুলোকে জাহাজের ডেক থেকে অনায়াসে নামিয়ে আনল, যেন সেগুলো খালি কাঠের বাক্স।

এখন জাহাজে কেবল বানর আর সাপেরাই রয়ে গেল। তাদের জাহাজে করে আরও দূরে যেতে হবে। ওডেসা থেকে নভোরোসিস্ক পর্যন্ত। তারপর নভোরোসিস্ক থেকে তাদের আরও দূরে স্তাভরাপোল! শহরের সেই পাইওনিয়ার বা অগ্রগামী শিশুদের কাছে যেতে হবে তাদের, যাদের সাথে জাহাজের নাবিক ও কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ছিল।

নতুন প্রতিবেশী

ওডেসা বন্দরে এসে লম্বা পথের ভ্রমণসঙ্গী হাতিরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল। ভিয়েতনামী হাতি বাক জাপ ও ভই কাই লনকে একটি মালবাহী ট্রেনে তুলে দূরদূরান্তের কোনও শহরের দিকে নিয়ে যাওয়া হল।

রবি ও শশীকে দুটি ট্রাকে তুলে শহরের রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। শহরের এক পাশে চিড়িয়াখানার গেট দিয়ে ঢুকে ট্রাক দুটি হাতিশালার সামনে থামল। ভারতীয় হাতিদের যাত্রাটি সংক্ষিপ্ততর।

"কী ছোট্ট দুটি ছানা!"

চিড়িয়াখানার প্রধান খারিতন খারিতনোভিচ অবাক হয়ে বললেন এবং তিনি তাড়াতাড়ি উত্তোলনকারী ক্রেন ডাকলেন। রবি আর শশী ছোট্ট ছানা ছিল বটে, কিন্তু তারা তো সাধারণ ছানা নয়, তারা ছিল হাতির ছানা। উত্তোলনকারী ক্রেন ছাড়া কাজটা করা অসম্ভব ছিল।

উত্তোলন ক্রেনসহ এক বিশেষ ধরনের ট্রাক আনা হয়েছিল এবং ট্রাক থেকে খাঁচাগুলো খুবই সাবধানে নামানো হয়েছিল।

সেই দীর্ঘ যাত্রার পর এই প্রথম রবি আর শশী মাটিতে পা রাখল। টলমল পায়ে তারা লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা আস্তাবলমতো জায়গার দিকে এগিয়ে গেল। আর সেখানে বেড়ার ওপাশে রবি আর শশী একটি বিশাল মাদী হাতি দেখতে পেল।

"এসো ছানারা, ওর সাথে পরিচিত হও! ও আমাদের 'দিল্লি'। ও তোমাদের মতোই একটা বাচ্চা। মাত্র দশ বছর বয়স বয়স ওর।" খারিতন খারিতনোভিচ ছানাদের বললেন।

ছানারা দিল্লির দিকে তাকাল। "আরে, এ আবার কেমন বাচ্চা! ও তো একটা বড় বাড়ির মতো লম্বা আর ওর ওজন ফেলেছড়িয়ে তিন টন তো হবেই!"

রবি আর শশীকে দিল্লির আখড়ার কাছাকাছি দুটো গাছের সাথে বাঁধা হয়েছিল, ওরা দিল্লির দিকে শুঁড় বাড়িয়ে দিল। রবি একটুখানি কাছেও যাওয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু দেখা গেল যে এই নতুন প্রতিবেশীটি ছোট্ট অতিথিদের সাথে পরিচিত হতে চাইছে না। সে উত্তেজিত হয়ে উঠল, চিৎকার করতে লাগল এবং শিকল ভাঙার চেষ্টা করল। এমনকি সে নতুন আসা ছোট্ট হাতিদের মেরেও ফেলতে চাইছিল প্রায়।

উত্তেজিত দিল্লিকে ছোট্ট হাতিগুলো থেকে দূরে, আস্তাবলের শেষ প্রান্তে সরিয়ে নিতে হল।

এই অসম্মানজনক আচরণে ছোট্ট হাতিদের মনখারাপ হল এবং দিল্লির দিকে তারা আর ফিরেও তাকাল না। রবি তার শুঁড়টা শশীর গলায় রাখল এবং তার অল্প কালো লোমে ঢাকা পিঠটায় শুঁড় বুলিয়ে দিতে লাগল।

এক ঘণ্টা বিশ্রাম

দুপুরের খাবারে হাতিদের দেওয়া হয়েছিল সেই নিয়মিত খাবার। দুধ ও চিনি দিয়ে রান্না করা ভাত।

শশী ভাতের বাটিটার দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "আমি খেতে চাই না— ব্যস!"

শশী একটু ভান করছিল।

ভাতের বাটি দেখে রবি তার শুঁড় তুলে মুখ খুলল। "দেখো, আমি এতটা বোকা নই যে আমাকে দেওয়া খাবার খাব না।"

সে এক মুঠো ভাত খেল। তারপর আরও এক মুঠো। এরপর তিন, চার, পাঁচ। এবং দেখতে দেখতে বাটিটা খালি হয়ে গেল।

শশী দেখল যে রবি শুধু নিজের ভাগেরটুকুই নয়, তার ভাগের ভাতও খেয়ে ফেলেছে। তাদের জন্য যখন আখ কেটে আনা হলো, সে তার শুঁড় দিয়ে মাহুতের হাত থেকে মিষ্টি রসালো আখগুলো ছিনিয়ে নিল।

এরপর শশী ঘাস খেতে আর আপত্তি করত না। রবির মতো সে ঘাস তুলে পিঠে রাখত না বটে, কিন্তু ঘাসের আঁটি মুখে পুরতে শশী রবির চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

দুপুরের খাবারের পর ওদের বিশ্রাম করার সময়।

শশী একপাশে সরে গিয়ে রোদ না পড়া একটা জায়গা বেছে নিল এবং তারপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। কী ক্ষতি বলো ঘণ্টা দুয়েক নাক ডেকে ঘুমিয়ে নিলে!

কিন্তু রবির এটা পছন্দ হলো না। সে শশীর দিকে এগিয়ে এসে পা ভাঁজ করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল!

শশী এক ঝটকায় উঠে পড়ল। অনিচ্ছা নিয়ে মাথা নাড়ল তারপর আরেকটু এগিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। "দড়িটা খুব ছোট। তুমি আমাকে ধরতে পারবে না।"

রবি তবুও তার কাছে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু ছোট দড়িটা তাকে তা করতে দিল না। শশী চুপচাপ বসে চোখ বন্ধ করল।

হঠাৎ শশী টের পেল কেউ তার লেজ ধরে টানছে— একবার, দুবার, তিনবার।

শশী চিৎকার করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কী হয়েছে!"

দেখা গেল যে রবি মজা করে শুঁড় বাড়িয়ে শশীর লেজ ধরে টানছে।

আখড়ার অন্য প্রান্তে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর তন্দ্রাচ্ছন্ন পড়ে থাকা দিল্লি শশীর চেঁচানিতে জেগে উঠল।

উফ! অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছে সে!

আনন্দ স্নান

হাতিগুলোর সাথে তাদের জন্য তৈরি গরম কাপড়ের চাদরগুলোও চিড়িয়াখানায় আনা হয়েছিল।

“যদি বাতাসের তাপমাত্রা পনেরো ডিগ্রির নিচে নেমে যায় তাহলে ওদেরকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেবেন।” ডক্টর রাও পরামর্শ দিলেন। “নইলে রবি আর শশীর ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমনকি হাতির ছানাদেরও সর্দিকাশি হয়।”

তখনও পর্দার প্রয়োজন পড়েনি। ছায়াতে তাপমাত্রা ছিল ত্রিশ ডিগ্রি, আর রোদে তার চেয়ে কিছুটা বেশি।

চিড়িয়াখানায় হাতিদের স্নান করার জন্য কোনো বিশেষ পুকুর ছিল না।

তাই রাস্তা ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত একটি লম্বা রাবারের পাইপ প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।

“আপনাদের কেউ কি স্নান করতে চান?” হ্যাঁ, কেউ একজন স্নান করতে চেয়েছিল।

যাতে হাতিগুলো ভয় না পায়, সেজন্য শুরুতে আকাশের দিকে তাক করে পাইপ দিয়ে জলের ধারা ছোঁড়া হয়েছিল আর তা বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে মাটির দিকে নেমে আসছিল। এভাবে বৃষ্টি নামানোর ছলে রবি আর শশীর ওপর জল পড়ল। বাচ্চা হাতিগুলো সবচেয়ে বড় জলের ধারার নিচে যাওয়ার চেষ্টায় আনন্দে চত্বর জুড়ে হুড়োহুড়ি করছিল। তাই জলের পাইপ এবারে সরাসরি হাতিগুলোর ওপর তাক করা হলো।

আনন্দে চিৎকার করতে করতে ও একে অপরকে ধাক্কা দিতে দিতে রবি আর শশী তাদের সামনের হাঁটু ভাঁজ করে পেছনের পা তুলে শরীর দোলাতে লাগল এবং জলের নিচে পিঠ পেতে দিলো।

"এখনকার মতো স্নান শেষ, ভালো জিনিসেরও বাড়াবাড়ি ঠিক নয়," হেসে বললেন প্রধান কর্মচারী। "এখন থেকে আমরা তোমাদের রোজ স্নান করাবো।" খারিতন খারিতনোভিচ হাতিদের মতোই এই স্নানের ব্যাপারে সমান আনন্দিত ছিলেন। তিনি দেখলেন যে ধীরে ধীরে রবি আর শশী তাদের নতুন জায়গায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। এখন শশীর আচরণ একেবারে বদলে গেছে। সে আর খামকা ভয় পেয়ে চিৎকার করত না বা কোণায় গিয়ে লুকোবার চেষ্টা করত না।

স্নানের সময় সে পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতো, কিন্তু তা খুব শান্তভাবে, ডান থেকে বামে ঘুরতে ঘুরতে। তার গায়ে জল পড়লে সে খুব আনন্দ পেতো।

আমরা তো জানি শশী স্নান করতে খুউব ভালোবাসত।

রবি ও শশীর হাঁটাহাঁটি

খুব ভোরে, চিড়িয়াখানায় ভিড় জমার আগেই, রবি আর শশী হাঁটতে বেরোলো।

যখন রবিকে দড়ি দিয়ে হাতির খাঁচা থেকে বের করে আনা হয়, শশী কোনো বিশেষ আমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা রাখে না, সে নিজে থেকেই রবিকে অনুসরণ করে। সামান্য এদিক-ওদিক দুলতে দুলতে হাতির ছানারা চিড়িয়াখানার গাছপালা ঘেরা মূল সড়ক ধরে একে অপরের পিছনে হেঁটে চলে। পথে তারা ঈগল, শিয়াল, সিংহ, উটপাখি, চিতাবাঘ এবং হরিণের খাঁচা পার হয়।

রবি আর শশীর মাথা সামান্য নত, শুঁড় প্রায় মাটি ছুঁয়েছে, কিন্তু এ ভাবা মোটেও ঠিক হবে না যে হাতির ছানারা অখুশি। বড় হতে হতে এবার রবি আর শশীর স্বভাবে কিছুটা ঔদ্ধত্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল।

চিড়িয়াখানার ঠিক সামনের অংশে খোলা একটা মাঠমতন জায়গা ছিল। সেখানে ছোট ছোট ঝোপ আর নিচু নিচু ঘন ঘাস গজিয়েছিল। হাতিরা সেখানে থামল। রবি ও শশীকে ছেড়ে দেওয়া হলো, আর তারপর ছানারা ঘাস খেতে শুরু করল।

রবি তখনও ঘাস ছিঁড়তে পারত না, কিন্তু সে শেখার চেষ্টা করছিল। সে আরও ঘাস ধরতে চাইত— কিন্তু তার শুঁড় তখনও প্রস্তুত ছিল না, হাতিশাবকটির গায়ে তখনও ততটা শক্তি হয়নি। মাঝে মাঝে খুব কষ্ট করে রবি এক মুঠো রসালো সবুজ ঘাস ছিঁড়তে পারত। তারপর মুখে দেওয়ার আগে সে আনন্দের সাথে অনেকক্ষণ ধরে ঘাসের মুঠিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করত।

শশী কিছুটা অলস ছিল। সে ঘাস ছিঁড়ত না। তার শুঁড়ে ছেঁড়া ঘাসের আঁটি রাখতে হতো তবে সে খেতো। শশীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রবি শুঁড় দিয়ে কিছু ঘাস নিয়ে তার দিকে ছুঁড়ে মারল।

"তোমাকে শিখতেই হবে। দেখ আমি কেমন করে ঘাস ছিঁড়ছি!" রবি যেন এটাই বলতে চাইছিল শশীকে। তারপর সে শুঁড় বাঁকিয়ে এক গোছা ঘাস মাটি থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করল।

ফেরার পথে আগের মতোই রবি দড়িতে বাঁধা অবস্থায় জাঁকালো ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে গেল আর শশী তাকে অনুসরণ করলো।

মাঝপথে একটা পিপের কাছে তাদের থামান হল। পিপেটা বেশ উঁচু ছিল— ছোট্ট ছানারা দেখতে পাচ্ছিল না ভিতরে কী আছে। কিন্তু রবি তৎক্ষণাৎ তার শুঁড়টা তুলে পিপেতে ডোবাল। পিপেয় জল আছে শুঁড় দিয়ে সেটা অনুভব করেই রবি জল খেতে শুরু করল।

রবি কী করছিল তা শশী বুঝতে পারছিল না। সে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল কিন্তু পিপেটার কাছে গিয়ে সে রহস্য উন্মোচন করার আগ্রহ দেখাল না।

জল খাওয়া শিখতে তার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। শশীকে জলের পিপের কাছে আনা হলো এবং তার শুঁড়টি হাত দিয়ে তুলে জল স্পর্শ করানো হল। কিন্তু শশী আবার জেদ ধরল এবং তার শুঁড়টি জল থেকে তুলে নিল। তখন চিড়িয়াখানার কর্মীরা শশীর উপর মুঠো মুঠো জল ছিটিয়ে দিলেন।

"দেখো শশী, এটা জল! জল! তুমি তো জলে স্নান করতে ভালোবাসো আর খুব মজা করে জল খাও! এখন খাও!"

কিন্তু শশী মাথা নাড়ল, গা থেকে জল ঝেড়ে ফেলল, তবুও জল খেতে রাজি হল না।

জল খাওয়া শিখতেই হবে শশীর। তাই তারা একটি জগে জল ভরে শশীর কাছে নিয়ে এল। জল দেখতে পেয়ে শশী আনন্দের সাথে তার শুঁড়টি জগের ভিতরে ঢুকিয়ে চুকচুক করে পুরোটা খালি করে দিলো।

রবি পিপের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু শশীকে জগ থেকে জল খেতে দেখেই সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে রাগে ফোঁস করে উঠল ও জগের দিকে শুঁড় বাড়িয়ে দিল। শশী কেন এই সুন্দর, চকচকে জগ থেকে জল খাচ্ছে, আর তাকে একটা সাধারণ পিপে থেকে খেতে হচ্ছে? এ কেমন বিচার!

কিন্তু শশী রবির ওপর একটুও রাগ করল না, এমনকি সে যে জগটার মধ্যে তার শুঁড়টা রাখল, তাতেও আপত্তি করল না। বেচারা খাচ্ছে খাক না! বন্ধুর ছোটখাটো উৎপাতকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে হয় বটে।

প্রতিবেশীর আচরণ বদলে গেল

রবি আর শশীর হাঁটাহাঁটি পর্ব শেষ হল। ফেরার সময় হল। তারা আবার চিড়িয়াখানার মূল সড়ক দিয়ে ফিরে এসে হাতিশালার দিকে রওনা হল। কিন্তু ছানারা সবেমাত্র দুপা এগিয়েছে কি এগোয়নি অমনি তারা কারও একটা চিৎকার শুনতে পেল।

চিড়িয়াখানায় পশুপাখিরা প্রায়ই নানারকম চিৎকার করে, এবং হাতিরা সেই শব্দ শুনতে বেশ অভ্যস্ত। যখন সিংহটা তার খাঁচায় গর্জন করে, তখন পাশের খাঁচার সিংহীটিও তার তিনটি ছোট শাবককে রক্ষা করার জন্য গর্জন করতে শুরু করে। রবি আর শশী ওসবে পাত্তা দেয়নি।

কিন্তু এবারের চিৎকারটা একটু চেনা চেনা ছিল। "চিৎকারটা কি দিল্লির হতে পারে?"

রবি আর শশী দ্রুত হাতির আস্তাবলের দিকে গেল। আর দিল্লি তখন রবি ও শশীকে নিরাপদে সুস্থভাবে ফিরে আসতে দেখে চিৎকার করা থামিয়ে আনন্দে তার শুঁড় ঘনঘন নাড়তে লাগল। "তাড়াতাড়ি এসো, আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি! কোথায় গেছিলে তোমরা?"

রবি ও শশী তাদের আস্তাবলের ভেতরে ঢুকে দিল্লির কাছাকাছি এগিয়ে গেল।

"হয়তো ওদের খুব কাছাকাছি যেতে না দেওয়াই ভালো। দিল্লি আবার ওদের ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে!" উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন খারিতন খারিতনোভিচ। কিন্তু দেখা গেল যে প্রধান কর্মচারী অকারণেই চিন্তা করছিলেন। দিল্লি তার শুঁড় দিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা হাতি ছানাদের আদর করছিল, আর তার ছোট ছোট স্নেহার্দ্র চোখদুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রবি ও শশী তাদের নতুন প্রতিবেশীর সাথে প্রথম অপ্রীতিকর সাক্ষাতের কথা অনেক আগেই ভুলে গিয়েছিল। তাই ওরা দুজন দিল্লির বিশাল শক্তিশালী পা দুটোর সাথে খুব শান্তিতে গা ঘষছিল।

চিড়িয়াখানা পরিদর্শন

চিড়িয়াখানার ফটকে কখনো দর্শনার্থীদের এত লম্বা লাইন হয়নি। তার উপর আজ রবিবার হওয়ায় লোকজনের ভিড় এমনিতেই অনেক বেশি ছিল।

"মনে হচ্ছে আমাদের লাইনে দাঁড়াতে হবে। তুমি কী বলো?" ক্যাপ্টেন চেরনোব্রভকিন তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন।

" ঠিক আছে। আমরা লাইনে দাঁড়াবো!"

ভোভা চেরনোব্রভকিনের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর, কিন্তু সে সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে প্রস্তুত ছিল। যতই কষ্ট হোক না কেন তাকে রবি আর শশীকে আজ দেখতেই হবে।

যখন লোকেরা তার বাবার জাহাজকে স্বাগত জানাতে বন্দরে এসেছিল তখন ভোভাও এসেছিল আর বড় হাতিগুলোকে ভালোভাবে দেখেছিল, কিন্তু ছোটগুলোকে ততটা ভালোভাবে দেখেনি — কারণ জাহাজঘাটা থেকে তাদের স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না।

কিন্তু সৌভাগ্যবশত তাদের সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি, তারা দ্রুতই ঢুকতে পেরেছিল। শীঘ্রই ক্যাপ্টেন চেরনোব্রভকিন ও তার ছেলে দাঁড়িয়ে রবি আর শশীর খেলা দেখার সুযোগ পেল। তারা একে অপরের কাছ থেকে ঘাস ছিনিয়ে নিচ্ছিল।

আস্তাবল ঘিরে ছিল মানুষের গিজগিজে ভিড়। আর এই ভিড়ে শিশু বেশি না প্রাপ্তবয়স্ক, তা কেউ বলতে পারছিল না। কিন্তু এটা নিশ্চিত ছিল যে রবি আর শশী একসঙ্গে খেলছিল আর ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাই ওদের খেলা প্রাণভরে দেখতে চাইছিল।

"কিন্তু এদের মধ্যে কোনটা কে?" বাবার কাঁধে চড়ে ভোভা চেরনোব্রভকিন আকুল গলায় জিজ্ঞেস করল।

"ডানদিকের জন রবি নামের একটি ছেলে, আর বামদিকের জন শশী নামের একটি মেয়ে" তার বাবা ব্যাখ্যা করলেন।

ক্যাপ্টেনের কাছেই ছিলেন তাঁর সহকর্মীরা— ইলেকট্রিশিয়ান শকোলভ, নাবিক কোলোমিৎজ, জুনিয়র অফিসার সাভোস্কিন এবং মেকানিক ইলিকভ। স্তাভরাপোল জাহাজের নাবিকেরা ছাড়া রবি আর শশীকে দেখে আর কে-ই বা এত বেশি খুশি হতে পারত? তাদের প্রাক্তন যাত্রীরা ভালো আছে কি না তা দেখতেই তারা সবাই আজ একে অপরকে না জানিয়ে কাকতালীয়ভাবে একসাথে চিড়িয়াখানায় এসে হাজির হয়েছে।

"ওরা তোমাদের দিকে তাকাচ্ছে না কেন?" ভোভা আকুল হয়ে আবার জিজ্ঞেস করল।

“হয়তো ওরা আমাদের ভুলে গেছে,” তার বাবা উত্তর দিলেন।

"হ্যাঁ, ওরা এখনও খুব ছোট। আর এত ভিড়ের মধ্যে ওরা হয়তো আমাদের দেখতেই পাচ্ছে না!" শকোলভ এমনভাবে বিড়বিড় করল যেন সে রবি আর শশীর পক্ষ নিয়েই কথা বলছে।

এই মুহূর্তে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল।

রবি ও শশী তাদের দিকে ঘুরে নিজেদের শুঁড় নাড়াতে শুরু করল।

"দেখো! দেখো! ওরা আমাদের চিনে ফেলেছে, ওরা আমাদের চিনে ফেলেছে!" শকোলভ আনন্দে শিশুর মতোই চিৎকার করে উঠল।

নাবিকরা আনন্দে উদ্বেলিত হল। আর সেই আনন্দ তাদের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সকলের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ল। ভারতীয় হাতি রবি ও শশী আনন্দের সাথে তাদের শুঁড় দোলাচ্ছিল, যেন তারা তাদের পুরোনো ও নতুন সোভিয়েত বন্ধুদের অভিবাদন জানাচ্ছে।

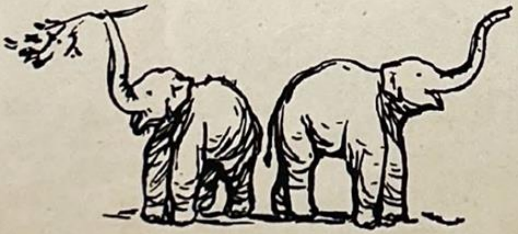

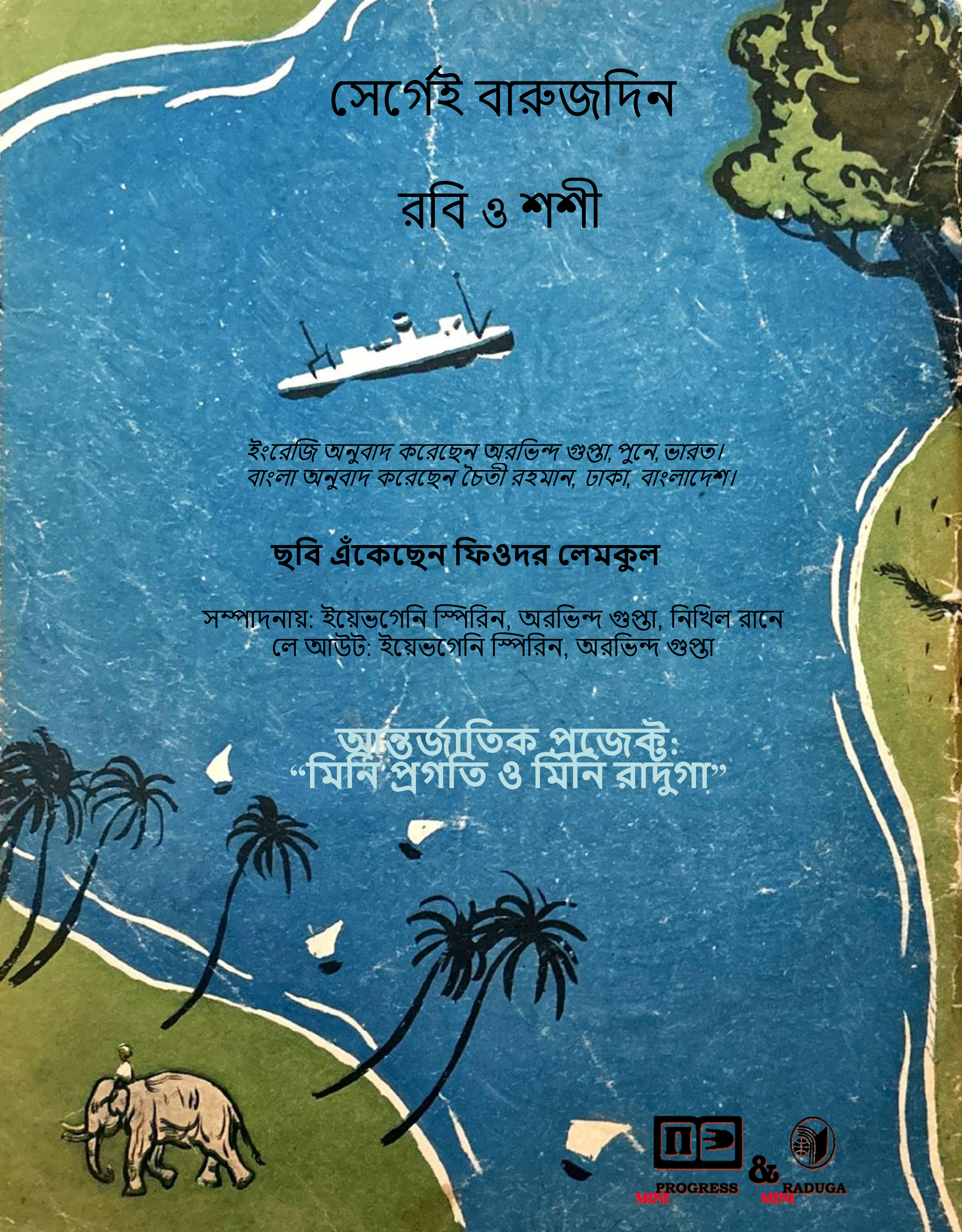

সের্গেই বারুজদিন

রবি ও শশী

ইংরেজি অনুবাদ করেছেন অরভিন্দ গুপ্তা, পুনে, ভারত।
বাংলা অনুবাদ করেছেন চৈতী রহমান, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ছবি এঁকেছেন ফিওদর লেমকুল

সম্পাদনায়: ইয়েভগেনি স্পিরিন, অরভিন্দ গুপ্তা, নিখিল রানে
লে আউট: ইয়েভগেনি স্পিরিন, অরভিন্দ গুপ্তা

আন্তর্জাতিক প্রজেক্ট:
"মিনি প্রগতি ও মিনি রাদুগা"

MINI PROGRESS & MINI RADUGA